সূচী

শ্রীভগবান

হৃদয়বান, মনস্বী ও সোদরপ্রতিম

বন্ধু

শ্রীঅরুণ দত্তের কর-কমলে "দুলালী" সমর্পিত হইল।

ইতি

গুণমুগ্ধ

১৮ই ফাল্গুন ১৩৩৩
কলিকাতা

এই "দুলালী" বইখানির একটা ভূমিকা লিখে দেবার জন্য প্রীতিভাজন লেখক মহাশয় আমাকে অনুরোধ করেছেন। আমি তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনে, কারণ আমি তাঁর কবিতা ও গল্পের নিয়মিত পাঠক; এবং সে সব পড়ে' অনেক সময়ই আমি তাঁর কাছে এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের কাছে তাঁর লেখার প্রশংসা করেছি।

কিন্তু এই গল্প-সংগ্রহ-পুস্তকের ভূমিকায় কি যে লিখতে হ'বে তা' আমি জানিনে। ভূমিকা অর্থে যদি সার্টিফিকেট হয়, তা' হ'লে বলতে পারি যে, লেখকমহাশয়কে সুলেখক বলে' আমার ধারণা; কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের দরবারে সার্টিফিকেট দেবার আমি কে? আর যদি সে ধৃষ্টতা প্রদর্শনও করি, তা' হ'লেও লোকে মানবে কেন? সুতরাং আমি ভূমিকা লিখতে পারলাম না; আমি আমার নিজের তরফ থেকে এই নবীন কবি ও গল্পলেখককে সংবর্দ্ধনা করছি এবং আশীর্ব্বাদ করছি তাঁর সাহিত্য-সাধনা জয়যুক্ত হোক।

গল্প-কয়েকটির কোন পরিচয় দেওয়া আমি অনাবশ্যক মনে করছি; যিনি এই সংগ্রহ-পুস্তকের গল্পগুলি পড়বেন, তিনি যে এগুলির সম্বন্ধে ভাল মত প্রকাশ করবেন, এ আশা আমার আছে।

১২ই ফাল্গুন ১৩৩৩ }
কলিকাতা }

শ্রীজলধর সেন।

দুলালী

ছেলেবেলায় দোসাদ-পাড়ায় সে-ই ছিল সবার চেয়ে সুন্দরী। তাহার জন্মের সময় তাহার বাপ নাকি কি একটা কারণে তাহাদের তেলকলের "সাহেবকে" অপমান করিয়া এক বৎসর জেল খাটিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর হইতে দুলালীকে লইয়া সে রঘুনাথপুরে দোসাদ-পাড়ায় বরাবর বাস করিতে লাগিল। একখানা খাপরার ঘর, তাহারই সঙ্গে একটু ক্ষেত, দুইটা গাই—এই সব লইয়া সে তাহার ছোট সংসারটি বেশ গুছাইয়া আনিতেছিল; দুর্ব্বিপাকের ক্ষতচিহ্ন প্রায় মিলাইয়া অসিয়াছিল। তাহাদের আরও একটি কন্যা জন্মিল; সে দেখিতে কালো—দুলালীর সঙ্গে রূপে তাহার তুলনাই হয় না।

দুলালী

পনর বৎসর বয়সে ছাতনা ষ্টেশনের "লাইন্‌স্‌ম্যান্‌" মন্নুয়া দোসাদের সহিত দুলালীর ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরই সে স্বামীর সহিত ছাতনার রেল-কোয়ার্টারে ঘরকন্না করিতে চলিয়া গেল। দুলালীর বাপ-মা তাহার ছোট বোনটির বিবাহ দিয়া জামাইকে ঘর-জামাই রাখিল।

***   ***   ***

মন্নুয়া, সুন্দরী বধূকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছিল। দোসাদের ঘরে অমন রঙ্‌—অমন রূপ, বড় একটা মিলে না। সে একেবারে মাতিয়া উঠিল। দুলালীকে সে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিত। পাশাপাশি কোয়াটারে আরও কয়েক ঘর রেলের খালাসী বাস করিত। বিদেশে টাকা রোজগার করিয়া সকলেই তাহার কতকাংশ মদ খাইয়া খরচ করিত। সন্ধ্যার সময় তাহাদের ঘরগুলার সম্মুখের মাঠটায় বসিয়া সকলে মিলিয়া এইরূপে সমস্ত দিনের শ্রমক্লান্তি ভুলিতে চেষ্টা করিত। কাহারও একটা মাদল, কাহারও হাতে একটা দাগকাটা বাঁশের বাঁশী—সকলে মিলিয়া নাচ, গান, হল্লা করিয়া, মাদল বাজাইতে বাজাইতে মদের পাত্রে চুমুক দিত। শীতকালে মালগাড়ী হইতে উঠাইয়া লওয়া কয়লা জ্বালিয়া তাহার চারিধারে বৈঠক বসাইত। এই সব আমোদের আসরে মন্নুয়া এক বিষয়ে সকলকে পরাজিত করিয়াছিল—সে সকলের চেয়ে বেশী মদ খাইতে

পারিত। তাহার উপর তাহার মেজাজটা ছিল বিষম খিট্‌খিটে। সব তাল পড়িত গিয়া দুলালীর উপর। প্রায়ই সে বাড়ী ফিরিয়া দুলালীকে মার-ধোর করিয়া না খাইয়াই শুইয়া পড়িত। দুলালী সমস্ত রাত প্রহারের বেদনায় কাঁদিত ও তাহার মাতাল স্বামীকে খাওয়াইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া রাত্রিশেষে ভোরের শীতল বাতাসে অভুক্ত অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িত। নেশার ঘোর কাটিলে, মনুয়া রাত্রির ঢাকা দেওয়া অন্নগুলির ধ্বংস সাধন করিয়া রেলের আলখাল্লাখানা মাথায় পাগড়ীর আকারে বাঁধিতে বাঁধিতে 'ডিউটি'তে বাহির হইয়া পড়িত। দুলালীর খোঁজ পড়িত—আবার যখন সে বারটার সময় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভাতের জন্য ফিরিত। দুলালীর রূপ ও তাহার স্বামীর এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া অনেক অবিবাহিত দোসাস যুবকের অন্তরে যুগপৎ লালসা ও আশার সঞ্চার হইত। তাহার কাণে অবশেষে দুই এক জন মন্ত্র-গুঞ্জরণের চেষ্টা করিতেও অগ্রসর হইল। কিন্তু দুলালী তাহাদিগকে এরূপ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল যে, তাহারা প্রত্যেকে দুলালী-লাভ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া অবশেষে অন্য কোন স্বজাতীয়ার সন্ধানে মনোনিবেশ করিল।

ছুটীর দিনে দুই চারি জন খালাসী, দল বাধিয়া, "কাঁড় বাঁশ" লইয়া নিকটস্থ শুশুনিয়া পাহাড়ের জঙ্গলে শৃগাল শিকার করিতে বাহির হইত। আর ট্রেণের নিত্যনূতন আরোহীদের মুখ ত আছেই। এইরূপে তাহারা কখনও বৈচিত্র্যের অভাব বোধ করে নাই। দেখিতে দেখিতে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া চলিল। মনুয়া আরও দুই

এক যায়গায় বদ্‌লী হইয়া অবশেষে চাকুলিয়া ষ্টেশনে কায়েম হইয়া গেল। পূর্ব্বের মতই সে দুলালীকে নিজের কাছে রাখিল। তবে এখন তাহাদের যৌবনের প্রথম আবেগ কাটিয়া গিয়াছে, দুলালী চার সন্তানের জননী।

*** *** ***

মনুয়া চিরকালই বদ্‌রাগী, তাহার উপর ইদানীং তাহার সুরাপানের মাত্রা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। "হোরী" পরব্ উপলক্ষে বহুদিন পরে আজ দুলালী পিতামাতার নিকট যাইতে চাহিল। মনুয়া প্রথমে কিছুতেই যাইতে দিবে না; অবশেষে অনেক কান্নাকাটি করিয়া ও এক-রকম জোর করিয়াই অনুমতি আদায় করিয়া দুলালী পিতৃভবনে যাত্রা করিল। যাইবার সময় মনুয়া তাহার রাঙা চোখ আর ভাঙা গলায় যথেষ্ট পরিমাণে ভীষণতা আনিয়া দুলালীকে শাসাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, চারি দিন পরে ফিরিয়া না আসিলে তাহার নিস্তার নাই।

কত দিন পরে দুলালী তাহার বাপের বাড়ীর মুখ দেখিল! তাহার সে বাল্যের লীলাভূমির মধ্যে কত পরিবর্ত্তন যেন অপরিচিতের মত তাহার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। সে আর তাহার বাল্যকালের পুরাতন স্থানটি খুঁজিয়া পাইল না; যাহা এক সময় নিতান্ত নিজের যায়গা ছিল, আজ তাহাকে সেখানে আসিয়া পরের আসন দখল

করিতে হইল। সে বাড়ীর সম্মুখে যে উঁচুনীচু মাঠ দেখিয়া গিয়াছিল তাহা আর নাই; সেখানে কাহার অট্টালিকা তৈয়ারী হইবে বলিয়া পাঁজা পুড়িতেছে। তাহাদের বাড়ীর পশ্চিমে যে ডোবাটায় সে দু'বেলা বাসন ধুইয়া আনিত, সেটাতে কোন ডেপুটী বাবুর সুনজর পড়িয়াছে। তাহার সঙ্কীর্ণতার আবরণ ও মলিনতার মূর্ত্তি দূর করিয়া তিনি উহাকে একটি প্রকাণ্ড স্বচ্ছ পুষ্করিণীতে পরিণত করিয়াছেন। কোথায় গিয়াছে তাহার চারিধারের সেই পুঁটুস্ গাছের কাঁটার ঝোপ! তাহার পরিবর্ত্তে উচ্চ প্রশস্ত পথযুক্ত একটি বাঁধে তাহার তিন দিক ঘেরা হইয়াছে; চতুর্থ দিকটিতে একটি সুন্দর মার্ব্বেল পাথরের ঘাট। সোপান-শ্রেণী উঠিয়া গিয়া একটি সরু লাল—কাঁকরের রাস্তায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সেই সরু পথের শেষে ডেপুটী বাবুর "সাহেবী" ধরণে তৈয়ারী "বাঙ্লো।" তাহার ফটকে স্বর্ণাভ অক্ষরে "The Dream" ক্ষোদাই করা।

নিজের বাড়ীর মধ্যেও দুলালী অনেক পরিবর্ত্তন দেখিল। তাহার বৃদ্ধ পিতামাতা আরও বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার কনিষ্ঠ ভগিনীর দুই পুত্র; স্বামী লইয়া সে বেশ সুখেই আছে। তাহার ভগিনীপতি বাবুলাল, দোসাদ পাড়ার মধ্যে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। সে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানী করে। বেশ নিরীহ ভালমানুষ। বাড়ীখানিরও শ্রী ফিরিয়াছে। দুধ বিক্রয় করিয়া ও পাড়ায় কয়েক ঘর "বাঙ্গালী বাবুর" বাড়ীতে রোজ দিয়া, মাসান্তে বেশ দুই পয়সা আইসে। উৎসবের মত আনন্দে চারি দিন কোন্ দিক দিয়া

ছুটিয়া পলাইল, দুলালী বা তাহার বাপের বাড়ীর কেহই তাহার সন্ধান পাইল না। বৃদ্ধ মাতাপিতার অশ্রু ও কাতর অনুরোধ, ভগিনী ও তাহার শিশু পুত্রদের সনির্ব্বন্ধ মিনতি, সর্ব্বোপরি নিজের অন্তরের. ক্ষণিক ফিরিয়া পাওয়া স্বাধীনতার অপূর্ব্ব আনন্দে সে আরও তিনটা দিন রহিয়া গেল। সপ্তম দিবসে কাঁদিতে কাঁদিতে সে যেন আবার নূতন করিয়া প্রথম স্বামিগৃহে চলিল।

মনুয়া যখন চারিদিন অপেক্ষা করার পর দুলালীকে আসিতে দেখিল না, তখন তাহার পঞ্চমে বাঁধা মেজাজ অতি সরলভাবে সপ্তমে চড়িয়া গেল। দুলালী পৌছিবামাত্র সে তাহাকে একটা কুঠারীতে তালা দিয়া সমস্ত দিন রাখিয়া দিল; পরে সে ছেলেদের চীৎকারে ধৈর্য্য হারাইয়া এবং সুরার মাহাত্ম্যে দুলালীর অবাধ্যতার মধ্যে অমার্জ্জনীয়-তার আভাস দেখিতে পাইয়া তাহাকে সমুচিত প্রতিফল সহ তাড়াইয়া দিবে ঠিক্ করিল। সে তাহাকে কুৎসিত গালিগালাজ করিতে লাগিল, পরিশেষে এক ষ্টেশন লোকের সাম্‌নে তাহার গাত্রবস্ত্র ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "সেই মিন্‌ষেদের কাছে যা।" তাড়াতাড়ি আট বৎসরের ছেলেটার কাপড় খুলিয়া লইয়া দুলালী লজ্জানিবারণ করিল; কিন্তু অপমানের তীব্র লজ্জায় সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের বাড়ী ফিরিয়া গেল।

* * * * * * * * *

দুলালী

দুই তিন দিন পরে হঠাৎ ঝড়ের মত মনুয়া দুলালীর বাপের বাড়ী আসিয়া হাজির! তাহার হাতে একটা ঝাল্‌দার ভোজালি; চোখ দু'টা রাঙা টক্‌টকে। বেশ বুঝা গেল, সে রাগে আর মদের ঝোঁকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সে এক ধার হইতে সকলকে গালি পাড়িতে লাগিল, তাহার পর না খাইয়া কোথায় বাহির হইয়া পড়িল। জানা গিয়াছিল, সে বাহির হইয়া সোজা ভাঁটি হইতে এক টাকা দিয়া আকণ্ঠ সুরাপান করিয়া আসিয়াছিল। বৈকালের দিকে কোথা হইতে মনুয়া আবার ফিরিয়া আসিল ও মেয়েপুরুষ কাহাকেও বাদ না দিয়া গালি দিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় ঘোড়ার সাজ খুলিয়া তাহাদিগকে দানা-পানি দিয়া বাবুলাল ঘরে ঢুকিয়াই মনুয়ার তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। সে মনুয়ার ব্যবহারে পূর্ব্ব হইতেই বেশ চটিয়া ছিল; তাহাকে এখন আবার "হল্লা" করিতে দেখিয়া সে একটু রাগতভাবেই বলিল, "এই মনুয়া, মদ খেয়ে মাতলামো করিস্ না।" আর যায় কোথায়, মনুয়া ক্রোধে একেবারে বাক্‌শূন্য হইল। এতক্ষণ তাহার একতর্ফা চীৎকারে সে নিজেই বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল, এইবার এই ধাক্কা পাইয়া তাহার ক্রোধ আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। সে কোন কথা না বলিয়া ভয়ঙ্করভাবে সেই ঝক্‌ঝকে ভোজালিখানা উঁচাইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল বাবুলাল প্রথমে ব্যাপারটা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর "হাঁ—হাঁ" করিয়া উঠিবার আগেই মনুয়া ভোজালিখানা সজোরে তাহার বুকের মধ্যে বসাইয়া দিল।

***　　***　　***

নিকটে গণপৎ সিং দারোগার বাসা। বাবুলালের স্ত্রী কাঁদিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল। তিনি "আউট পোষ্ট" হইতে পুলিস আনাইয়া মন্নুয়াকে ধরিলেন। রক্তাক্ত ভোজালিখানা সমেত মন্নুয়াকে ছয় জন পাহারাওয়ালার জিম্মায় থানায় পাঠান হইল। বাবুলালকে ধরাধরি করিয়া কয়েকজন পাহারাওয়ালা ও দোসাদ যুবক হাসপাতালে লইয়া চলিল। বাবুলালের স্ত্রী "ওরে আমার বাবুয়া—কোথা গেলি রে" বলিয়া মর্ম্মভেদী স্বরে নিশীথ-গগন কাঁপাইয়া তুলিল। দুলালী মুখখানা চূণ করিয়া বসিয়া রহিল।

হাসপাতালে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বাবুলালের মৃত্যু হইয়াছিল। ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট মোকর্দ্দমা দায়রা-সোপর্দ্দ করিলেন। মন্নুয়াই যে বাবুলালকে আঘাত করিয়াছিল এবং সেই আঘাতেই যে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহা প্রমাণিত হইয়া গেল। মন্নুয়াও তাহা স্বীকার করিল। তাহার স্বপক্ষে কেহই ছিল না; সকলেই একবাক্যে বলিল, মন্নুয়া বদ্‌রাগী লোক, দাঙ্গা ও মারপিট করা তাহার স্বভাবসিদ্ধ। বাবুলালের স্ত্রী উকীল নিযুক্ত করিল, কিন্তু মন্নুয়ার কোন উকীল ছিল না। সকলেই

কাণাঘুষা করিতে লাগিল যে, দায়রা জজ ফাঁসীর হুকুম দিবেন। ক্রমে সে কথা দুলালীর কাণে উঠিল।.........

অপমানিত হইবার পর হইতে দুলালী মন্নুয়ার উপর আন্তরিকভাবে বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার মাতলামো ও কুব্যবহার দুলালীর মনে অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিল, তাহার পর এই ভগিনীপতির মৃত্যু-ব্যাপারে সে মন্নুয়াকে তাহার প্রেমাস্পদরূপে চিন্তা করিতেও ভয় পাইয়াছিল। সে ভাবিল, যেমন আমায় ষ্টেশনের শত লোকের সাম্নে অপমান করিয়াছে, তেমনই এখন বেশ হইল; সে একটু শিক্ষালাভ করুক্। দুলালী ভাবিল, সত্য কথাই আদালতে বলিয়া আসিবে; হউক্, তাহার দশ বিশ বৎসর জেল হউক্, বা, "দ্বীপ-চালানে" যাউক্। অমন "খুনে'র" সহিত ঘর করিয়া কি হইবে?

কিন্তু যখন সে শুনিল, মন্নুয়ার ফাঁসী হইবে, তখন সে একটা বেশ বড় রকমের ধাক্কা খাইল। জেল নহে, দ্বীপচালান নহে, একবারে ফাঁসী! সে স্বামীর শাস্তিকামনা করিয়াছিল বটে, কিন্তু এরূপ শাস্তি কল্পনা করে নাই। তথাপি তাহার মনে হইল, যেমন লোক, তাহার তেমনই সাজা হওয়া দরকার। তাহার প্রতি মন্নুয়ার গত কয়েক বৎসরের দুর্ব্ব্যবহার সে যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই ঘৃণায়, ক্রোধে, তাহার মন কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। সে অবশেষে একরূপ স্থির করিয়াই ফেলিল যে, সত্য ঘটনাই বলিয়া আসিবে। তাহার হৃদয়ে মন্নুয়ার জন্য আর প্রেম কোথায়? সে বন্ধন ত বহুদিন

মন্নুয়া ছিন্ন করিয়াছে ; কিসের জন্য তবে আর তাহাকে রক্ষা করা ?

*** *** ***

দায়রা জজের আদালত লোকে লোকারণ্য। মন্নুয়ার প্রতি বিচারকের রায় যে কি হইবে, সকলেই তাহা প্রায় একরূপ স্থিরনিশ্চিত-ভাবে আন্দাজ করিতে পারিয়াছে। একে একে সমস্ত সাক্ষীরই শুনানী হইয়া গেল ; তাহার পর শেষ, অথচ প্রধান সাক্ষী মন্নুয়ার স্ত্রীর ডাক পড়িল তাহাকে আনিবার জন্য একজন আদালতের চাপরাশওয়ালা পিয়ন ছুটিল।·········এমন সময় বর্ষণোন্মুখ গম্ভীর আষাঢ়-মেঘের মত স্তব্ধ ধীরমূর্ত্তি দুলালী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বড় বিষাদময় গাম্ভীর্য্যের সহিত জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল। আদালতে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজমান। জনাকীর্ণ প্রশস্ত কক্ষ গম্ গম্ করিতেছে, বুঝি জোরে নিশ্বাস ফেলিলেও তাহা সকলে শুনিতে পায়! কেহ তাহাকে পথ দেখাইল না, কেহ তাহার গতিরোধ করিল না, সে স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে নিজের অটুট স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়া অতি ধীরে ধীরে একেবারে জজের চেয়ারের কাছে উপস্থিত হইল। বিশাল জনসঙ্ঘ দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত ফলাফল দেখিতে লাগিল। জজ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নীরবে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। হঠাৎ দুলালী থামিল। যোড়হস্তে সে

বিষাদ-গম্ভীর স্বরে বলিল, "ধর্ম্মাবতার!" তাহার অশ্রুসজল চক্ষু ভূমিসংলগ্ন হইল, তাহার কণ্ঠস্বরে ও সমস্ত ভঙ্গিতে একটি অনির্ব্বচনীয় ভীষণ দৃঢ়তা স্পষ্ট হইয়া উঠিল; অন্তরের সমস্ত বেদনা যেন মথিত করিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার স্বামীর দোষ নাই; আমার ভগিনীপতি বাবুলাল আমায় সে বার জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, যাইতে দেয় নাই, সে আমায় বে-ইজ্জত করিয়াছিল; আমার স্বামী সেই কথা জানিতে পারিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছিল ও বাবুলালকে প্রথম দেখিবামাত্র মারিয়াছে।" দুলালী চুপ করিল। তাহার কণ্ঠস্বর আদালত-গৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নিস্তব্ধ কক্ষ আবার নিস্তব্ধ হইল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, দুলালী যেমন আসিয়াছিল তেমনই চলিয়া গেল—কেহ তাহার গতিরোধ করিল না।

* * *   * * *   * * *

মনুয়ার ফাঁসী হইল না, জেল হইল। দুলালীকে তাহার বাপ-মা তাড়াইয়া দিল।

—o—

মা

রাঁচির একটা অফিসে আমি ষাঠ্ টাকা মাইনের 'টাইপিষ্ট্'। জীবনের যা কিছু বন্ধন, হুগ্‌লি জেলার একটী গ্রামের ছোট কুঁড়ে-ঘরে ফেলিয়া, পেটের দায়ে, আড়াইশ' মাইল দূরে, এই চাকুরী করিতে আসিয়াছি। ঠিক্ নিজের পেটের দায়ে নয়; কেন না ছেলেবেলা হইতে আজ পর্য্যন্ত নিজের জন্য ভাবনাটা কখনো বড় করিয়া ভাবি নাই। বিশ্বাস আছে, নিজের দিন একরকম চলিবেই,—কেন না তাহার ভার বড় বেশী নয়। কেবল বৃদ্ধা মাতা শেষবয়সে কষ্ট পাইবেন, ইহা দেখিতে পারিব না বলিয়াই দাদাকে তাঁহার কাছে রাখিয়া, মাসে মাসে সেখানে টাকা পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হইতাম। দাদা আমার চেয়ে এক বছরের বড়।

এক দিন পাঁচটার সময় অফিসের কাজ শেষ করিয়া যখন তাড়াবন্দী টাইপ্-করা কাগজগুলি একপাশে ঠেলিয়া রাখিলাম, তখন আপনা হইতেই আমার মন যেন হাল্‌কা হইয়া ছুটির আনন্দে ভাসিবার জন্য প্রস্তুত হইল। আফিসের অন্যান্য লোকেরা নিকটে নিজের নিজের 'কোয়ার্টারে' থাকিত। আমার জন্য যায়গা না হওয়ায়, সাহেব

আমায় কিছু মাসিক ধার্য্য করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—সহরে কোথাও বাসা করিয়া থাকিতে।

সেদিন বৃষ্টি হইবে বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। সঙ্গে ছাতা ছিল না। কিন্তু যখন ছুটি হইল, তখন অবিশ্রান্ত ধারায় ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে! আমার সহকর্ম্মীরা তাঁহাদের নিকটের বাসায় রুমাল-মাথায় বা কাগজ-মাথায় ছুটিয়া পৌঁছিলেন। অফিস-বারান্দায় রহিলাম আমি একা! তাঁহাদের মধ্যে দু' একজন আমায় নিজেদের কোয়ার্টারে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু এই বর্ষার অবিরল ধারায় আমি অকারণ-পুলকের সন্ধান পাইয়া সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলাম।

অবশ মন ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল! আমি সেই বারান্দার উপর দুই গালে দুই হাত দিয়া উবু হইয়া বসিলাম। সম্মুখের বৃষ্টির সুর আমার মনকে যেন কোন্ দূর-দূরান্তরে লইয়া যাইতেছিল! বাদলের উদাস হাওয়ায় সে যেন উধাও হইয়া উড়িতেছিল! একে একে কত কথা মনে পড়িতে লাগিল! এম্‌নি বরষার দিনে ছোটবেলায় কত দিন কি আনন্দে উঠানে বৃষ্টির জলে স্নান করিয়াছি! কত দিন এমনি ভাবে বর্ষা-সজল সন্ধ্যায়, শূন্যমনে গাছের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, আর বড় বড় জলের ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া পল্লব হইতে পল্লবান্তরে ঝরিত! সে সব দিন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আজ যেন আবার তাহাদিগকে নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইতেছিলাম।

এমন সময় আমার স্বপ্নাবেশ ভঙ্গ করিয়া টেলিগ্রাফ-পিয়ন তাহার

দুলালী

লাল রঙের সাইকেলে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া তাড়াতাড়ি আমি যেখানে ছিলাম সেইখানে উঠিল। ভাবিলাম, সকলেই ত চলিয়া গিয়াছে,—কাহার বিপদের খবর এ বহন করিয়া আনিল? বাঙালীর জন্য ত টেলিগ্রাফে বিপদের সংবাদ ছাড়া অন্য কিছু থাকে না! এমন সময় ভিজা কোটের পকেট হইতে সন্তর্পণে একটা কাগজে-মোড়া লাল খাম বাহির করিয়া সে আমার হাতে দিয়া বলিল, "বাবু, জেরাসে দেখিয়ে ত ইস্‌কা পাত্তা কাঁহা মিলে গা?"·········যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়!········ভয়ে ভয়ে সেটি হাতে লইয়া দেখিলাম, উপরে আমারই নাম। পিয়নকে সই দিয়া ভিতরের কাগজটি পড়িতে পড়িতে আমার মন অনিশ্চিত আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। আমাদের সুমুখের বাড়ীর সতীশ-মামা টেলিগ্রাফ করিয়াছেন যে, আমার দাদা জ্বর-বিকারে মর মর, আমি যেন শীঘ্র বাড়ী যাই।

গ্রাম-সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মজুমদারকে আমি মামা বলিতাম। তিনি গ্রামেই চাষ-বাস লইয়া চিরকাল থাকেন ও বিপন্নের সর্ব্বসময় যথাসাধ্য সাহায্য করেন। আমাদের বাড়ীর সুমুখেই তাঁর বাড়ী। ছেলেবেলা হইতে আমরা তাঁহাকে ভক্তি করিতাম ও ভালবাসিতাম। তিনিও এই পিতৃহীন বালককে বরাবর সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন ও আমাদের সংসারের অনেক ভার স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে লইয়াছেন। যেদিন চাকুরীর সংবাদ পাইয়া আমি চিরদিবসের বাঙ্‌লাদেশ হইতে সুদূর ছোটনাগপুরে বাস করিতে আসিতেছিলাম, সেইদিন দুপুরে

তিনি আমায় ডাকিয়া কত উপদেশ দিলেন, কত কথা বুঝাইলেন। যখন ট্রেণে উঠাইয়া দিয়া তিনি বিদায় লইলেন, তখন তাঁর চোখে-মুখে উদ্বেগের ভাব স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল, যেন তাঁহারই সন্তান দূরদেশে চলিয়াছে! তিনি বলিলেন যে, মাকে তিনি সান্ত্বনা দিবেন, আমাদের বাড়ীর সমস্ত দেখাশুনা করিবেন। তাঁহার ভরসায় নিশ্চিন্ত হইয়া আমি এই প্রবাসের কষ্টময় দিনগুলি যতদূর সম্ভব মধুর করিবার চেষ্টা করিতাম। আজ যখন তিনিই ব্যস্ত হইয়া আমায় খবর দিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন বুঝিলাম অসুখ সাংঘাতিক। কেন না, অল্পে তিনি আমায় ব্যস্ত করিতেন না।

শঙ্কায় আমার মুখের ভাব বোধ হয় অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিল; পিয়ন বলিল, "বাবু—কুছ্ খারাব্ খবর্?" সেই খোট্টাদেশের লোক-টিরও চোখ সহানুভূতিতে স্থির ও সজল হইয়া উঠিয়াছিল! "হাঁ, ভাইকা বেমার্", বলিয়া আমি বারান্দা হইতে নামিবার উপক্রম করিলাম। পিয়নের কথা অগ্রাহ্য করিয়াই সেই বৃষ্টির মধ্যে সাহেবের কুঠির দিকে ছুটিলাম—ছুটির জন্য! টেলিগ্রাফ দেখাইয়া যখন সাহেবকে বলিলাম যে, ইহাদের জন্যই এতদূরে গোলামী করিতে আসিয়াছি, ও ইহজগতে ইহারাই আমার সর্ব্বস্ব, তখন তিনি বিনা ওজরেই ছুটি দিয়া, যাইবার সময় সহানুভূতিসূচক স্বরে বলিলেন "Cheer up Babu, and God be with you." ছুটি পাইয়া পাগলের মত আবার পথে নামিলাম। তখনো বৃষ্টি থামে নাই।

দুলালী

দশটার ট্রেণে যাইব বলিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে পা দিয়াছি, এমন সময় চাকর বলিল, "বাবু, ও-বাড়ীর মা একবার ডাকলেন।" ....আমি যে ঘরখানি ভাড়া লইয়াছিলাম, তাহা একটি বিধবার। তাঁর একটি ছেলে ও মেয়ে লইয়া তিনি রাঁচিতে থাকিতেন, ও অন্য একটি ছেলে পাটনায় কাজ করিত। স্বামীর ভিটা বলিয়া ও খরচের সুবিধা বলিয়া তিনি রাঁচিতেই বাস করিতেন। বাড়ী-ভাড়ার সামান্য টাকা, ও পাটনার পুত্রের নিকট হইতে যাহা আসিত, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া স্বামীর স্মৃতি-বিজড়িত বাড়ীটিতে থাকিতেন। ইনি আমায় মায়ের ন্যায় স্নেহ করিতেন।.........আজ আমি হঠাৎ চলিয়া যাইতেছি বলিয়া হয় ত তিনি দেখা করিতে ডাকিয়াছেন, এই ভাবিয়া আমি গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁর কাছে গেলাম। কিন্তু গিয়া দেখি, তিনি একখানি পত্র হাতে করিয়া কাঁদিতেছেন। আমায় দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বাবা এই দেখ, পাটনা থেকে মনোজ আমায় চিঠি দিয়েছে যে, তা'র হঠাৎ খুব অসুখ করেছে। সে শয্যাগত। অভাগীর যে রকম কপাল, তা'তে কখন যে কি ঘটে জানি না। তুমি বাবা আমায় পাটনায় রেখে আসবে চল। আমি ত একলা যেতে পারব না, আর আমার কে-ই বা আছে?" তখন আমার অবস্থা তাঁকে বুঝাইয়া বলিলাম; কিন্তু উপায়ান্তর না থাকায়, আমি তাঁহাকে পাটনায় পৌছাইয়া দিয়া সেই দিনই চলিয়া আসিব ঠিক হইল। এক সঙ্গে, সেই রাত্রেই দশটার গাড়ীতে আমরা রাঁচি পরিত্যাগ করিলাম।

বাদলের কালো মেঘে চাঁদ লুকাইয়াছিল,—আবছায়ায় রাতটি আরো ভয়ানক মনে হইতে লাগিল। তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে। গাছের পাতায় পাতায় বর্ষার জল ঝরঝর করিয়া ঝরিতেছিল। যেন জলে-ভেজা সেই তরুদের শত শত চক্ষু হইতে নীরব-অশ্রু অবিরল স্রোতে ঝরিতেছে! প্রকৃতি স্তব্ধা, মসীময়ী। অন্ধকার শালবন ও বন্ধুর পার্ব্বত্য-ভূমির উপর দিয়া ছোটগাড়ী হুস্ হুস্ শব্দে ছুটিতে লাগিল! কে জানিত যে, বিষাদময় চিত্রের মধ্য দিয়া অধিকতর বিষাদের দিকে ছুটিতেছিলাম!

এই সময়ে আমার শীত করিতে লাগিল। প্রথমে ভাবিলাম, ও কিছু নয়, বাদ্‌লা হাওয়ায় অমন শীত করিয়া থাকে। কিন্তু যখন জানালা তুলিয়া দিয়া, গায়ে কাপড় জড়াইয়াও শীত ভাঙিল না, তখন বুঝিলাম জ্বর আসিয়াছে! আমার সহযাত্রী রাঁচির মা-টিকে আর উহা জানাইয়া ব্যস্ত করা উচিত মনে করিলাম না। সুতরাং সেই অবস্থাতেই রহিলাম। তারপর দিন সকালে পাটনায় তাঁহাকে মনোজের নিকট রাখিয়া আমি দেশে রওণা হইলাম।

যখন ট্রেণ হইতে নামিয়া গ্রামের দিকে চলিতেছিলাম, পা যেন আর তখন আমায় বহিতে পারিতেছিল না। একে রাত্রি-জাগরণ ও

পরিশ্রম যথেষ্টই হইয়াছিল ; তা'র উপর, গায়ে কত ডিগ্রি জ্বর তা' কে বলিবে ? অবশ ক্লান্ত দেহ অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া গ্রামের দিকে চলিলাম। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতেই শুনিলাম, "বল হরি—হরিবোল !" সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক আমার দাদাকে খাটে করিয়া লইয়া পথে বাহির হইল। অচেতন জড়ের মত সমস্ত স্থির হইয়া দেখিলাম। হঠাৎ ভীড় হইতে সতীশমামা বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "বাবা, এত দেরী হল কেন ? আমার 'তার' সময়ে পৌঁছে থাকলে, তোমার ত কাল আস্‌বার কথা ! ভাইটি আর তোমায় দেখ্‌তে পেলে না !" আমি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম "মামা, আমি যে আমার এক বিপন্ন প্রতিবেশিনীর উপকার করতে গিয়ে এই দেরী করে ফেলেছি—তাঁকে আমি 'মা' বলি।" সতীশমামার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। ধীরে, গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'বাবা, তোমার বড় দুঃসময় চলেছে, মনের বল হারিয়ো না—দৃঢ় হও ; ভগবান তোমার মঙ্গল করুন !"

"চলুন মামা, এ কাজটা শেষ করে ফেলি।" বলিয়া শ্মশান পর্য্যন্ত আমি আমার ভাইয়ের অনুগমন করিলাম।······ জ্বর গায়েই সকলের মানা সত্ত্বেও স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সতীশমামা আসিলেন। আমি সদরে পা দিয়াই কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিলাম "মা !"— প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল "মা-আ—আ" ! আবার ডাকিলাম ; কেহ উত্তর দিল না। তখন সতীশমামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মামা, মা কোথা ?" উত্তরে তিনি নীরবে উর্দ্ধ দিকে অঙ্গুলি দেখাইলেন। তখন

আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। সতীশ-মামাও ছোট ছেলের মত আমায় বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একটু স্থির হইয়া শেষে তিনি বলিলেন—"বাবা, তোর মা যখন স্বর্গে গেলেন, তখন আমি তোকে খবর দি' নাই—নরেশকে দিয়েই তাঁর শ্রাদ্ধ শেষ করাই। জান্‌তাম, তা হলে কা'র বলে তুই টিকে থাক্‌বি? তাই তোকে গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে আস্‌তে দি'নাই। কিন্তু ভগবান যখন তোর ভাইটিকেও নিতে এলেন, তখন দেখলাম যে, আর তোকে ফাঁকি দিতে তিনি দেবেন না। ভেবেছিলাম, তুই এলে নিজ-মুখেই তোর মায়ের খবর দেবো। তোর ভাইকে প্রাণের মত ভালবাসতাম, এক-দিনের তরেও তাকে মায়ের অভাব বুঝিতে দি' নাই; কিন্তু এত কোরেও তাকে বাঁধ্‌তে পার্‌লাম না রে!" বলিয়া তিনি আবার কাঁদিয়া উঠিলেন।

সময় কাটেই—সে রাতও কাটিল। তার পরদিন সকালে সতীশ মামার পায়ের ধূলা ও সম্মতি লইয়া পাটনায় রওণা হইলাম।

উদ্‌ভ্রান্তের মত যখন সেখানে পৌছিলাম, তখন বাদলের কালো মেঘ ঘনভাবে সন্ধ্যাকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে! কড়া নাড়িতেই মনোজের ছোট ভাই কপাট খুলিয়া দিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, মাটিতে শূন্য শয্যার পার্শ্বে, শীর্ণ মলিন মুখে তাহার জননী বসিয়া! আমায় দেখিয়াই তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন, "বাবা, আমার মনোজ যে আর নাই।" প্রত্যেক অক্ষর উচ্চারণ করিতে যেন বিধবার একএকখানি

বুকের পাঁজর ভাঙিয়া যাইতেছিল। আমিও আর থাকিতে না পারিয়া তাঁর পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িয়া বলিলাম—"আমারো মা, ভাই, যে এক সঙ্গে আমাকে ফাঁকি দিয়েছে!"

তাঁহার চক্ষের অশ্রু শুকাইয়া আসিল। করুণাপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কি কর্‌বি বাবা, আয়, পুত্রহীনার কোলে উঠে আয়,—আমি তোর আজ থেকে মা হ'লাম।"

সন্ধ্যার সেই করুণ অন্ধকারে যেন আবার মাতৃমুখ দেখিতে পাইলাম!

—o—

ভূখ্লী
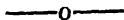
ভরা-যৌবনে কিষণ মাহাতোর স্ত্রী বিধবা হইল। মাতৃহীন ভূখ্লী, সেই যে কখন্ দশ বৎসর বয়সে বাপের বাড়ী হইতে পিতার সৎকার শেষ হইবার পর, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রথম স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, তাহা আজ আর তাহার ভাল করিয়া মনে পড়ে না। তাহার পর দীর্ঘ দশ বৎসর আরো গত হইয়াছে। তাহাদের ছোট ঘরখানিকে সে লেপিয়া পুঁছিয়া ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে রাখিয়াছিল। তাহার স্বামী মুনিষ-গিরি করিত, কিন্তু উপার্জ্জনের প্রত্যেক পয়সাটি সে সম্ভব হইলেই বন্ধুদের সঙ্গে তাড়ি বা ধেনো মদ খাইয়া উড়াইয়া দিত। কাযে কাযেই ভূখ্লীর বিবাহিত জীবন মোটেই সুখের হইতে পারে নাই। এর-ওর বাড়ীর তরি-তরকারী মাড়িয়া, এবং মার-ধোর খাইয়া সে কোন কোন দিন স্বামীর কাছ হইতে যাহা নগদ আদায় করিতে পারিত, তাহাতেই অতিকষ্টে তাহার দুঃখের দিনগুলিকে সচল করিয়া লইতে-ছিল। এমন সময় কিষণ তাহার সমস্ত দুঃখ-দুশ্চিন্তার অবসান করিয়া দিয়া অকালে বিদায় লইল। সেদিন ভূখ্লী দেখিল, ঘরে একমুঠা চাল নাই বা একগণ্ডা পয়সা নাই—বুঝিল এভাবে আর চলিবে না।

***   ***   ***

সে সহরের এক 'বাবুঘরে' কামীনের কাজ লইল। সেখানে ভোর হইতেই উঠিয়া যাইত—বাবুদের স্কুল-কাছারীর ভাত; বেলা এগারটা পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। বাসন মাজা—বাজার করা—গৃহিণী রাঁধিবেন, তাঁহার ছেলে ধরা। তা'র পর সকলে অফিস—কাছারী—স্কুল যে যা'র গেলে, ভূখ্‌লী ছুটি পাইত। বাবুদের বাড়ীতেই সে দুবেলা খাইত। দুপুরেও সে কোথাও যাইত না। সন্ধ্যার পর সকলের খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা পলারী বা সান্‌কীতে ভাত ঢাকিয়া লইয়া সে তাহার পাড়ায় বাড়ীর দিকে রওণা হইত। তাহাদের মাহাতো পাড়াতেই বাবুদের মালী নন্দা'র বাস। সে ভূখ্‌লীকে বাড়ী পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দিয়া যাইত।

নন্দা অবিবাহিত। সে প্রতিদিন বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার পথে ভূখ্‌লীর কাণে গুন্‌গুন্ করিয়া প্রণয়-নিবেদন করিতে লাগিল। বলিল যে, কিছু টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই সে ভূখ্‌লীকে বিবাহ করিয়া ভিন্ গাঁয়ে ঘর বাঁধিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভূখ্‌লীর বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না; দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে তাহার একটি দিনও স্মরণে আসে না যে দিনকার কোন মধুর স্মৃতি তাহার মনকে অতীতের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারে। এই প্রণয়-নিবেদন তাহার কাছে প্রথম প্রেমসম্ভাষণের মত মধুর স্বপ্নময় বলিয়া মনে হইল।

* * *

কিছুদিন পরে ভূখ্‌লী সন্তান-সম্ভাবিতা হইল। আর ত থাকা চলে না। সে মনিব বাড়ীর কাজ ছাড়িয়া পলাইল। নন্দা কিছুদিন তাহাকে খোর-পোষ দিতে লাগিল; অবশেষে একদিন বলিল, "ত্যাখ্‌ ভূখ্‌লী, যা' রোজগার, তা'তে দুটা পেট ভর্‌বেক্‌ নাই; আবার ছেইলা হ'লে তা'কে লিয়ে কি খাওয়াব? আয়, তুক্‌ করে উটাকে মরাই দি'।" এ প্রস্তাবে ভূখ্‌লী কিন্তু রাজী হইল না। সে নন্দাকে ধরিয়া বসিল "এবার আমায় বিহা কর্‌।" নন্দা সটান উত্তর দিয়া দিল—"ছেইলাটাকে নাই মার্‌বি ত তোকে নাই রাখ্‌ব।" একাজ করিতে ভূখ্‌লী কিছুতেই সম্মত হইল না। নন্দার সহিত তাহার একদিন কথায় কথায় ঝগড়া বাধিয়া গেল। নন্দা তাহার শেষ অস্ত্র অমোঘ তীব্রতার সহিত নিক্ষেপ করিল—সে কোনমতে এই দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহে- সে ব্যাঙ্গের সুরে বলিল "ইঃ, কস্‌বীর আবার তেজ ত্যাখ্‌!" সর্পাহতের মত ভূখ্‌লী এই কথায় চম্‌কাইয়া পিছাইয়া গেল।

—২—

"বাবু, ভুখা ভূখ্‌লী দু'টি ভিখ্‌ মাঙ্‌ছে বাবু!" রুক্ষ-কেশ, শুষ্ক-মুখ, ছিন্ন-পরিধেয় এক যুবতী ভিক্ষা মাগিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর মধ্যে তাহার ডাক পড়িল—সে কূয়া হইতে জল তুলিয়া বাবুদের দশ গাদা বাসন মাজার পর একমুঠা ফ্যান্‌-ভাত ও একটা পেঁয়াজ পাইয়া,

দুর্ভিক্ষগ্রস্তের মত এক নিঃশ্বাসে সব ক'টি ভাত খাইয়া ফেলিল।

তাহার মানসিক যন্ত্রণা ও দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তার মধ্যে যখন একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তখন তাহার স্বজাতীয়েরা তাহাকে একঘরে করিল বটে; কিন্তু নারীজীবনের এই প্রথম কলঙ্কের বিষফলটিও তাহার কাছে অমৃতোপম মাধুরী-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। নন্দার সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া দিবার পর সে কতকটা উদাস ও কতকটা আলুথালু উন্মাদের মত হইয়া পড়িয়াছিল। পুত্রমুখ দেখিয়া তাহার ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থতা ফিরিয়া আসিতেছিল। ছেলেটিকে টিপ্ পরাইল, কাজল দিল, ভিক্ষা করিয়া তেল আনিয়া সারাগায়ে মাখাইয়া রোদ্রে শুখাইতে লাগিল - সাধ করিয়া তাহার নাম রাখিল "যাদুমণি।" পথের লোক যখন তাহার দিকে আঙুল দেখাইয়া হাসা-হাসি করিত সে তাহার যাদুমণিকে আরো জোরে বুকের উপর চাপিয়া তাহার দুই গালে অকারণ উচ্ছ্বসিত চুম্বন অঙ্কিত করিতে করিতে, কোনদিকে না চাহিয়া পথ চলিয়া যাইত। পথের লোক তাহাকে বলিত "পাগ্লী"।

'পাগ্লী' ভিখ্ মাঙিত, লোকের বাড়ীর বাসন মাজিয়া, কাপড় কাচিয়া দিত; যে যখন পাগলীকে দেখিতে পাইত, সে-ই তখন তাহাকে খাটাইয়া লইত। কেহবা কিছু তাহার জন্য পারিশ্রমিক দিত, কেহ বা কিছু দিত না। কিন্তু যে কিছু দিত না, সে যদি যাদুমণির সহিত একটু আদর করিয়া কথা বলিত কিংবা ভূখ্লীকে বলিত, "পাগ্লী, তোর বেশ ছেলে"; অমনি আহ্লাদে গলিয়া গিয়া সে একমুখ হাসি ও একবুক

তৃপ্তি লইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইত; তুচ্ছ পারিশ্রমিকের জন্য আর দাঁড়াইয়া থাকিত না।

তবে ভগবানের কৃপায় ভূখ্‌লীর একদিনও অনাহারে কাটে নাই। যাহাদের সময়ে অসময়ে কাজ করিয়া দিত, তাহারা যখনই জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিত,'পাগ্‌লী' কিছু খায় নাই, অমনি তখনই হয় চাট্টি মুড়ি নয়ত একমুঠা ভাত সে পাইত। কেহ বা 'যাদুমণিকে' নিজের ছেলের একটা ছেঁড়া রঙীণ জামা—বা একটা কাঠের খেল্‌না দিত—ভূখ্‌লীর আনন্দ আর ধরিত না।

কিন্তু অভাগীর এত আনন্দ সহিল না। একদিন হঠাৎ যাদুমণির খুব জ্বর আসিল। পূর্ব্ব হইতেই তাহার সর্দ্দি করিয়াছিল। ভূখ্‌লী তখন কাজ করা বন্ধ করিল। ভোর হইলেই ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া কাপড়ে যাদুমণিকে জড়াইয়া, বুকে লইয়া সরকারী হাসপাতালে উপস্থিত হইত। ডাক্তারবাবুকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন, অনুরোধের উপর অনুরোধ করিয়া বিরক্ত করিয়া তুলিত। নাড়ী দেখিয়া, জিব্‌ দেখিয়া, পেট টিপিয়া হয়ত ডাক্তারবাবু প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান্‌ করিয়া দিলেন; কিন্তু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি জননী ভূখ্‌লীর চোখ এড়ান সহজ নয়; সে ধরিয়া বসিল "ডাক্তারবাবু, ঐ তুমার পাকিটের নল্‌টা কই লাগালে?" ডাক্তারবাবু হয়ত চটিয়া বলিলেন, "পাগ্‌লীকে নিয়ে আচ্ছা দায়ে পড়েছি—আমার যেন আর অন্য রুগী নাই, ওঁর ছেলেকেই দশ ঘণ্টা ধরে' দেখ। যা, যা, তোর হয়ে গেছে।" তারপর অন্য রোগীদের দিকে ফিরিয়া :—"ওরে তোরা সব দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস্‌ এগিয়ে আয় না।"

"হেঁই বাবু, আর টুক্‌হু ভাল করে' দেখ ; আমি ভিখ্ মেঙে খাই বাবু, বড় গরীব ; আর আমার কেউ নাই, আমার 'যাদুমণি'কে ভাল করে' দাও—ভগবান তুমার ভাল কর্‌বেক্।" অভাগীর চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিত—অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ডাক্তারবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে শিশুর জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল তাহার উপর উপযুক্ত আচ্ছাদনের অভাবে সামান্য সর্দ্দিজ্বর, ডবল নুমোনিয়ায় পর্য্যবসিত হইল।

একদিন বেলা বারোটার সময় হঠাৎ ঝড়ের মতন ভূখ্‌লী ছেলে কোলে করিয়া হাসপাতালের মধ্যে হাজির। সে সময় ডাক্তার সাহেব (সিভিল্ সার্জ্জন) হাসপাতালে একঘণ্টার জন্য আসেন—ভূখ্‌লী ইহা জানিত। সে একেবারে সটান গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে যাদুমণিকে নামাইয়া দিয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মুখ-চোখ ফুলিয়া উঠিয়াছিল—তাহাতে তখন একটা অস্বাভাবিক ভাব ফুটিয়াছে—সে বলিল "সাহেব, তু-ই আমার যাদুমণিকে বাঁচা, ইয়ারা লার্‌লেক্।"

ডাক্তার সাহেব ভাল করিয়া পরীক্ষার পর ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু যাদুমণি রহিল না। অৰ্দ্ধোন্মাদিনী জননীর উন্মাদনা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া সে এক শ্রাবণ-সন্ধ্যায় বিদায় লইল। আকাশে তখন তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, অবিরল ধারায় বাদলের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিতেছিল, ভূখ্‌লী আর চোখের জল ফেলিল না।

নদীর ধারে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ছেলের মৃতদেহ নিজ-হাতেই পুঁতিয়া দিল। আর সে পূর্ব্বের মত কারণ-অকারণে হাসিত না; লোকে কাজ করিতে ডাকিলে আসিত না—কতক দিন বা খাইত, আবার কতক দিন বা উপবাস করিত। তাহাদের পাড়ার কেহ আর তাহার মুখ দেখিতে পাইত না। অর্দ্ধরাত্রে সে নিজের ক্লান্ত দেহ টানিয়া সহরের অপর প্রান্তস্থিত বালিকা-বিদ্যালয়ের বারান্দায় শুইয়া থাকিত; আবার কাক-কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সহিত উঠিয়া ছিন্নবস্ত্রাঞ্চল গায়ে টানিয়া বাহির হইয়া পড়িত। নিতান্ত পেটের জ্বালা ধরিলে, বা ৩।৪ দিন উপবাস করিবার পর, হয়ত একদিন শুনা যাইত, কাহারো বাড়ীর দরজা ধরিয়া সে কাতর-কণ্ঠে বলিতেছে, "বাবু, ভুখা ভুখ্‌লী দু'টি ভিখ্‌ মাঙ্‌ছে বাবু!"

—৩—

সহরের পশ্চিম দিকে একটি ছোট অথচ নিবিড় বন; তাহার পরই 'কাহার্‌-ডি' গ্রাম। সেই গ্রামের গণু-মাহাতোর মেয়ে পশম-মণি'র সহিত আজ নন্দার বিবাহ।

ভুখ্‌লী আজ দিন দশ হইতে যেন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। তাহার মুখের সদা-বিষণ্ণতার পরিবর্ত্তে কঠোরতা আসিয়া সে স্থান অধিকার করিয়াছে। নন্দার বিবাহের কথা সে লোকমুখে শুনিয়াছিল। আজ-

কাল পাগ্‌লী আবার সকলের কাজকর্ম্ম করিয়া দেয় ; কিন্তু সে ইদানীং কাজ করিলেই দু', এক আনা পয়সা চাহিত। "পাগ্‌লী, পয়সাতে কি হ'বে ? দুটি ভাত খাবি ?" উত্তরে সে বলিত "ভাত নাই লিব, পয়সা দে।" ইহার বেশী সদ্‌যুক্তি সে দেখাইতে পারিত না।

আজ নন্দার বিবাহ—একটা নূতন কাপড় হলুদে ছুপাইয়া, সখা-সহচর পরিবৃত হইয়া গো-শকটে করিয়া নন্দা কাহার-ডি' অভিমুখে চলিয়াছে। সকলেই আনন্দের কোলাহল তুলিয়া পথ-প্রান্তর নগর-কান্তার মুখরিত করিতে করিতে চলিয়াছে। মাদল বাজিতেছে, দেশী বাঁশের বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে আনন্দের মঞ্জুল সুর ছন্দিত হইতেছে, কেহ বা গান গাহিতেছে আর কেহ তাহাতে তাল দিতেছে ; হাস্যোজ্জ্বল চন্দন-চর্চ্চিত স্মিতমুখে নন্দা সকলের মাঝে বসিয়া সকলের সঙ্গে স্ফূর্ত্তি করিতে করিতে চলিয়াছে।

বরযাত্রীর দল হল্লা করিতে করিতে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

এ ধারে ভুখ্‌লী তাহার উপার্জ্জিত অর্থে একটা চক্‌চকে বড় রকমের ছুরী কিনিল—বন হইতে একটা গাছের বিষাক্ত শিকড় আনিয়া বাটিল ও ছুরীতে লেপিয়া রৌদ্রে শুখাইতে দিল। তারপর যেদিন নন্দার বিবাহ করিতে যাইবার কথা, সেদিন ছুরীখানি সন্তর্পণে কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া সে বনের দিকে চলিল।

বনের মধ্য দিয়া 'কাহার-ডি' যাইবার সরু পথ-রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহারই একটা বাঁকের মুখে, খানিকটা দূরে ৫।৬টা পিয়াল গাছ খানিকটা যায়গা যুড়িয়া অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া আছে। ভুখ্‌লী সেইখানে ওঁৎ পাতিয়া রহিল—মনে তখন তাহার তুফান উঠিয়াছে, চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিতেছে! সে কাপড়ের উপর বার বার হাত বুলাইয়া দেখিয়া লইতেছিল, ছুরীটা যথাস্থানে আছে কি না! এমন সময় মাদলের শব্দে বনভূমি চঞ্চল করিয়া নন্দা সদলবলে সেই পথ দিয়া 'কাহার-ডি'র দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল!

যখন বরযাত্রীর দল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তখন ভুখ্‌লী গাছের আড়াল ছাড়িয়া বাহির হইল; কিন্তু বাহির হইয়া-ই সে আবার ছুটিয়া অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। এত বড় নৃশংস কার্য্য করিতে সে দৃঢ়-সংকল্প হইতে পারিল না। কিন্তু লুকাইয়া পড়িয়াই, নন্দার সেই শেষ সম্ভাষণের কথাগুলি মনে পড়িল, তা'রপর মনে পড়িল যাদুমণিকে—সে আবার ছুটিয়া বাহির হইল; কিন্তু লোকজন কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলিবার পূর্ব্বেই সে আবার স্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া সে স্থির হইতে পারিল না; আজ সে নন্দার ইহলীলা শেষ করিয়া দিবে বলিয়াই এত আয়োজন করিয়াছে, সে আর ফিরিতে

পারে না। ততক্ষণ নন্দার দল খুব নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, আর কিছুক্ষণ পরেই তাহারা চলিয়া যাইবে; তখন আর চেষ্টা করিলেও সে চেষ্টা সফল হইবে না। নন্দার হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রখানি দূর হইতে দেখিয়াই ভুখ্‌লী বুঝিয়াছিল যে সে সকলের সম্মুখে বসিয়াছে। পিছন হইতে আক্রমণ করা অসম্ভব। ছুরীটি, কাপড়ের উপর হইতে অনুভব করিয়া দ্বিধাশূন্যভাবে সে তৃতীয়বার অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সহিত বাহির হইয়া গেল। বাহিরে যাইতেই একেবারে নন্দার সহিত তাহার চোখা-চোখী হইল।

কতদিন পরে আজ হঠাৎ সে নন্দাকে আবার দেখিল! মাঝে দীর্ঘ দেড় বৎসর অতীত হইয়াছে—ইহার মধ্যে তাহার নিজের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু নন্দা'র সেই সৌম্য বলিষ্ঠ শরীর তেমনি আছে; তাহার সেই প্রশস্ত বক্ষ—প্রথম যৌবনে যাহার উত্তপ্ত পরশে সে অননুভূতপূর্ব্ব অমৃতলোকের স্বপ্নমাধুরীর আস্বাদ পাইয়াছিল, তাহা আজ চকিতে আবার ভুখ্‌লীকে তাহার সেই প্রথম ও শেষ সুখের দ্যুলোক-ভূমিতে লইয়া গেল। ভাল হউক, মন্দ হউক, এই নন্দাই ত তাহার নারী-জীবনে প্রথম প্রণয়মাধুরী সঞ্চারিত করিয়াছিল!

চিরস্থায়ী না হউক, পুণ্যমণ্ডিত না হউক, মাতৃত্বে যে কি অপূর্ব্ব সুখ, এই নন্দাই ত তাহার প্রথম আস্বাদ তাহাকে দিয়াছিল! নন্দার মুখখানা দেখিবামাত্র, বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় নিমেষ-মধ্যে তাহার মনে এই ভাব খেলিয়া গেল—সে ত্রস্তা হরিণীর মত শেষবার ছুটিয়া পলাইল। সে

যখন পিছন ফিরিয়াছে তখন নন্দার চোখ তাহার উপর পড়িল ও নন্দার সঙ্গীরা সেই সঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল "ওরে, পাগ্লীরে—পাগ্লী বটেক্!"

—৪—

বিবাহ করিয়া নন্দা বধূসহ ফিরিতেছে। এবার তাহার সঙ্গীর দল আরো বেশী বড়। কন্যাযাত্রী ও বরযাত্রী মিলিয়া কম করিয়া ২৫ জন হইবে। তাহারা সকলে কয়েকখানা গরুর গাড়িতে আসিতেছিল। সকলের সম্মুখে দুইখানা ডুলি—একটিতে বরবেশে নন্দা, অপরটিতে দশবছরের রাঙা-কাপড় পরা পশম-মণি।

নন্দার মুখ কিছু বিষণ্ণ, এমন কি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে মনে হয়—চিন্তিত। তাহার কোন দিকে লক্ষ্য নাই। মানুষ উত্তেজনার বশে কোন একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়া, নিজের ভ্রম উপলব্ধি করিবার পর যেমন উত্তেজনা শেষ হইয়া গেলে অনুতপ্ত চিত্ত লইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া থাকে—তখন যেমন তাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাওয়া যায় না, তখন যেমন সে আর সোজা হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না,—তেমনি নন্দা আর সহযাত্রীদের কোন আনন্দে সাড়া দিতেছিল না, সে নিজের ডুলিতে নির্জীব জড়ের ন্যায় মাথা হেঁট করিয়া আসিতেছিল, যেন কোন আঘাত পাইয়া তাহার মন ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

যখন সে বিবাহ করিতে যায়—তখন ভূখ্‌লীর সেই অপ্রত্যাশিত অকস্মাৎ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে-ই তাহার সমস্ত আনন্দ তিরোহিত হইয়াছে। ইদানীং সে শুনিত ভূখ্‌লী পাগল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভূখ্‌লী সযত্নে নন্দা'র কর্ম্মস্থান বা মাহাতো-পাড়া পরিহার করিয়া চলিত। তাই এই দেড় বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও সে ভূখ্‌লীকে দেখে নাই। আজও যখন দেখিল, তখন ভূখ্‌লী পিছন ফিরিয়া পলাইতেছে। নূতন করিয়া তাহার মনে হইল সে নির্লজ্জের মত অন্যায় করিতে চলিয়াছে, কিন্তু তখন ফিরিবার পথ নাই, সে তখন অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বিবাহ করিয়া ফিবিবার পথে সে এই কথাটাই বার বার ভাবিতেছিল।

*** *** ***

ভূখ্‌লী দেখিল, যে জন্য আসা, তাহা ত সফল হইল না—সে নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তা বলিয়া হাল ছাড়িল না। সে নন্দার ফিরিবার সময়, বনের সহরের দিকের ধারটিতে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দূর হইতে মৃদঙ্-মাদলের শব্দ যতবার তাহার কাণে আসে, ততবার অসহ্য তীব্রতায় তাহার বুকের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া উঠে। যখন নন্দার ও পশম-মণি'র ডুলি, গাছের আড়ালে দেখা দিল, ভূখ্‌লী আর দ্বিধা করিল না, ভাবিয়া দেখিল না, অপেক্ষা করিল না—উন্মাদিনীর মত কাপড়ের মধ্যে ছুরী শক্ত করিয়া ধরিয়া একেবারে দুই ডুলি'র বাহকদের মাঝে আসিয়া পড়িল।.........

নন্দা এইবার দেড়বৎসর পরে প্রথম, ভূখ্লীকে অতি নিকটে ও সম্পূর্ণরূপে দেখিল ; দেখিয়া স্পষ্টভাবেই শিহরিয়া উঠিল। এই সেই ভূখ্লী ! প্রথম যৌবনের অনুপম মাধুরী-মণ্ডিত, নিটোল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—টানা টানা কাজল-কালো চক্ষু, মুখের সেই কমনীয় ভাব—সুন্দরী, যুবতী, ভূখ্লী ; আর কোথায় এই আজিকার শীর্ণদেহ, রুক্ষকেশ, কোটর-প্রবিষ্ট নিষ্প্রভ-চক্ষু, হতশ্রী, কঙ্কালসার পাগ্লী ! ইহার এ দশা কে করিয়াছে ?—নন্দার বক্ষের স্পন্দন সশব্দে বলিতেছিল—নন্দা, নন্দা, নন্দা ! আজ ভূখ্লীর এ দশা দেখিলে সয়তানের ও প্রাণ কাঁদে। পাষণ্ড নন্দার চক্ষু ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল ! পূর্ব্ব হইতেই তাহার মন ভাল ছিল না—হঠাৎ তাহার সম্মুখে আজ ভূখ্লীকে এই মূর্ত্তিতে দেখিয়া তাহার পাষাণ-বক্ষের প্রকাণ্ড পাথরটা একটু নড়িয়া গেল, বহুদিবসের রুদ্ধ উৎসমুখ দিয়া দুই ফোঁটা জল অশ্রুরূপে তাহার চক্ষের কোল সিক্ত করিল। কিন্তু নন্দার এই অশ্রু দেখা দিবার পূর্ব্বেই ভূখ্লী বস্ত্রান্তরাল হইতে বিষাক্ত ছুরীকাখানি বাহির করিয়া উঁচাইয়া ধরিয়াছে—লোকজন ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল।·········

ভূখ্লী, নন্দার অশ্রুসিক্ত চক্ষুর দিকে একবার ও পশমমণির ভীতি-বিবর্ণ মুখের দিকে একবার চাহিল—তা'রপর সকলের আশঙ্কা নির্ম্মূল করিয়া আপনার পঞ্জর-সার বক্ষে ছুরীকাটি আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল !

ইহজন্মে তাহার দ্বারা নন্দার শরীরে আর অস্ত্রাঘাত করা হইয়া উঠিল না।

——o——

স্বামী
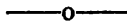
'নাতি বিয়ে করছিস্ কখন ?'

'এই পাত্রী যোগাড় হলেই।'

'হ'বার আগেই হয় না ?'

'ঠাকুরদা, আমরা ত আপনাদের মত স্খলিত দন্ত, পলিত কেশ নই ; এত তাড়াতাড়ি কর্‌বো কি জন্যে ? ধীরে-সুস্থে হলেই হবে—এখন ত কল্পনায় আমার মানসী তৈরী হচ্ছেন—বছর কতকের ভেতর চেলির কাপড়ের মধ্যে তাঁর দেখা পাবো।'

একটা তাচ্ছিল্যের সহিত "হুঁ" করিয়া তিনি উত্তর দিলেন "তোরা ত ভারী বিয়ে কর্‌বি, একটা, কি বড় জোর দুটো।"

'রক্ষে কর ঠাকুরদা, একটার বেশী বল্‌ছি না।'

"আমরা কি রকম বিয়ে করতাম জানিস ? একবারে একশো, দুশো ! মুদীর দোকানে যেমন একটা লম্বা হিসাবের খাতা থাকে, আমাদের তেমনি একটা খাতায় প্রত্যেক বউয়ের নাম আর ঠিকানা লেখা থাক্‌ত। গামছা ছিঁড়্‌লে, দাড়ি কামাবার পয়সার অভাব হ'লে, একটা বিয়ে করে' সেটা ওই খাতায় জমা করতাম। তেমন বিয়ে তোরা কর্‌তে

পারবি ? এক একবার লিষ্ট ধরে' বেরিয়ে পড়তাম শ্বশুরবাড়ী—একরাত্রি করে' প্রত্যেক শ্বশুর বাড়ীতে থাকলে, বছরে রোজই জামাই আদর কপালে যুটত! আর তোরা এখন একটা বিয়ে করেই অস্থির হয়ে পড়িস্!"

কথাটা হইতেছিল বকুলতলায় সান্-বাঁধানো বেদীর উপর বসিয়া। সন্ধ্যার সূর্য্য কখন টুপ্ করিয়া বাঁশবনের আড়ালে ডুবিয়া গিয়াছে লক্ষ্য হয় নাই। চৈত্রমাস। আই-এ পরীক্ষা দিয়া দিনকতক গ্রামের কলকোলাহলহীন শান্ত ছায়ায় বিশ্রাম করিতে আসিয়াছি। বসন্ত বিদায় লইতেছে; প্রকৃতি যেন বেদনায় উদাস। তবু তরুপল্লবে, আকাশে বাতাসে তখনো আনন্দের সুরটি লাগিয়া আছে - একেবারে নিস্তব্ধ হয় নাই।

এই আনন্দ মনেও রঙ্ ধরাইয়া দেয়। সমস্ত জিনিষের মধ্য দিয়া প্রাণের সাড়া বহিয়া যায়। চৈতালি ক্ষেতের মধুর গন্ধ তখন শীতল বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। পশ্চিমে, 'যমুনা-সায়রে'র তটস্থ তাল ও খেজুর গাছের চূড়া অস্তমিত সূর্য্যের শেষ-রশ্মিতে স্বর্ণময়; সন্ধ্যাকাশ সচকিত করিয়া বলাকা চলিয়াছে! সাঁঝের শঙ্খ, মন্দিরের ঘণ্টারতি, ধেনুর হাম্বারব, আমাদের "বাঁশী" গ্রামের প্রাণের বাঁশীটি যেন বাজাইয়া তুলিয়াছে। গোধূলিধূসর পল্লীপথে বালকের দল তখনো ক্রীড়ারত।

দুলালী

এই শান্ত মধুর সন্ধ্যার ছায়ায় বকুল-তলায় অশীতিবর্ষের প্রাচীন ঠাকুরদাদার পার্শ্বে আমি বসিয়া। মনটি তখন আমার পায়ের নীচের কচি দুর্ব্বাদলের মতই সজীব ও তাজা। সব দৃশ্য, সব কথাই তখন আমার কাছে মধুরিমায় ভরা মনে হইতেছিল।

কিছু একটা উৎসবের আশায় যখন আমার অশান্ত মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল তখন আমি হঠাৎ উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলাম "একটা গল্প বলুন না ঠাকুরদা ?" আমার মুখের দিকে তাঁর উৎসুক নেত্র মেলিয়া ঠাকুরদাদা বলিলেন "কি গল্প বল্‌ব ভাই ?"

"এই, আপনাদের সময়কার একটা কিছু ঘটনা—সেকেলে ধরণের, আমাদের সময় যা হতে পারে না, যা হোক্ একটা কিছু ?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "আজকাল বুঝি আর রূপকথায় মন ওঠে না ? রাজপুত্র, দৈত্য, পরী, এদের ঘটনা বুঝি ঘটনাই নয় ? শোন্ একটা খুব ভাল গল্প বলছি।

এক পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় একটা বিকট দৈত্য বাস করত !"

আমি বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম "ও ত ঢের শুনেছি ; আর না। আজ একটা সত্যি-কিছু ঘটনা বলুন—যা আপনাদের সময়ে হয়েছিল।"

"তবে আমাদের যে দেড়শো দুশো বিয়ের কথা হচ্ছিল, তারই একটা গল্প বলি, কি বল্ ?" আমি খুব আগ্রহের সহিত আমার সম্মতি জানাইতেই তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "নাতির দেখছি বিয়ের গল্পে

ভারী ঝোঁক। থাম্ তোর বাবাকে বল্ছি বিয়ে দিয়ে দিতে, তখন তুই-ই আমাকে কত একালের বিয়ের গল্প বলতে পারবি। আচ্ছা, এখন না হয় আমিই একটা তোকে সেকালের গল্প ব'লি ; কিন্তু শোধ দেওয়া চাই।" তখন তিনি হাসিতে হাসিতে এই ঘটনাটি বলিলেন।—

সে অনেক দিনের কথা ; ধর্ না কেন এই আমি যখন তোর চেয়ে কিছু ছোট, সে সময়ের। বরিশালে একজন কুলীন বামুন ছিল, নাম আদিত্য ; বয়স তার ষাট পেরিয়ে দু'তিন বছর এগিয়ে পড়েছে। তার খাতার পাতাও ফুরিয়ে এসেছে। বউদের প্রথম শ'কতকের মুখ ত মনেই পড়ত না! এমন কি খাতার প্রথম পাতাগুলোর লেখাও অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে এসেছিল।

তখনকার প্রথামত একবার পিঁড়েয় বসে কতকগুলো ফুল ফেলে দিয়ে যদি কেউ মেয়ের 'আইবুড়ো' নাম খণ্ডন করে দিত, তা হলে সেই মেয়ের-বাপের কৃতজ্ঞতা, একশো দেড়শো রূপোর চাক্তীর আকারে অই বরের বাক্সে শোভা পেত। তারপর কোথায় বা বর, কোথায় বা মেয়ে! কন্যা বাপের বাড়ীতে চির-কুমারীর মত থাকত, আর পাত্র আবার চন্দনের ফোঁটায় কপাল ঢেকে আর কারো আইবুড়ো নাম খণ্ডন করতে যাত্রা করতেন!

এখন এই যে টাকা আমদানীর একটা উপায় ছিল, এতে এই পাষণ্ডদের টাকার মোহ আরো বেড়েই চল্‌তো। ঘরে পাঁচশো পুঁজি থাকলে আরো পাঁচশো আনবার ফিকিরে থাক্‌তো। শেষে এই লোভ এদের এত প্রবল হয়ে যেত যে এরা টাকার জন্যে এমন পাপ ছিল না যা করতে কখনো শিউরে উঠত! এ ঘটনাটা তারই একটা নমুনা।

শত্রুমুখে ছাই দিয়ে আদিত্য যখন ষাটের কোঠা পেরিয়ে গেল—তখন সে যতই সুপাত্র হোক, তার আদর একটু কমে এল। তখন সে দেখলে যে ভারী বিপদ, ব্যবসা 'মন্দা' পড়ে যায়! টাকা যদিও কিছু ছিল, তবু—গড়ান জল আর কতদিন, এই প্রবাদ বাক্যের কথা ভেবে সে কিছু আমদানীর চেষ্টায় অস্থির হয়ে উঠল।

এমন সময় চঞ্চলা লক্ষ্মী তাকে আর একবার দর্শন দোবো দোবো করলেন। একদিন ঘুরে ঘুরে আদিত্য তার এক শ্বশুরবাড়ী পর্য্যন্তই চলে এল! সেখানে এসেই দেখলে যে এক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তাই হ'তে লেগেছে। বাড়ীর সকলেই জামাইয়ের এই হঠাৎ দেখা পেয়ে যেন আহ্লাদে কি করবে খুঁজে পাচ্ছে না। যতই হোক জামাই-আদর কিনা! তা সে 'শতবেরে'ই হোক আর 'সহস্রবেরে'ই হোক্‌।

শ্বশুর বাড়ীতে দুটো দিন কাটতে না কাটতেই আদিত্য একটা জিনিষ চট্‌ করে আবিষ্কার করে ফেল্‌লে। তার শ্যালক শ্যামাকান্ত অস্বাভাবিক রকমে উৎসাহ-হীন হয়ে পড়েছে। সে যেন সব সময়েই উন্মনা আর বিমর্ষ হয়ে রয়েছে। সম্বন্ধীর সঙ্গে একটা ঠাট্টা করবার আশায় আদিত্য সেদিন

তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে 'কি হে বড়কুটুম, অমন শুকনো কেন? বিরহ-টিরহ হয়েছে নাকি?' বলে নিজের স্ফূর্ত্তিতে নিজেই খুব একচোট গালভরা হাসি হেসে নিলে। শ্যামাকান্ত খ্যাঁক্ করে উত্তর দিলে 'খুব হয়েছে, যাও যাও, আমার মত বংশজ ঘরের হলে বুঝতে। ফুর্ত্তি হবে কোত্থেকে? তোমাদের মতন ত নয়। টাকা দোবো, তবে বিয়ে!' রুদ্ররসে আরম্ভ করলেও শ্যামাকান্ত কিন্তু উপসংহারে একটা ফোঁস্ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে!

তখন আদিত্যচন্দ্রের মাথায় একটা ফন্দি যুটে গেল। কিছু উৎফুল্ল হয়েই সে বলে উঠল, "আরে সে জন্যে আবার ভাবে?"

এখন সে সব দিনে বংশজ বংশের দুর্দ্দশা ছিল বড়ই বেশী। এদের ঘরে 'বৌ' নিয়ে আসতে গেলে হাজার, পনরশো, কি অই রকম একটা মোটা গোছের সেলামী দিতে হ'ত। আর বেচারারা যখন নিজের ঘরের মেয়ে পার করত, তখনও কিছু টাকা দিয়ে ভঙ্গকুলীনের ঘরের জামাইকে সম্প্রদান করত; কেন না এতে তাদের খুব সম্মান বাড়্ত। আমাদের আদিত্য নাথও ভঙ্গকুলীন।

এখন আদিত্যের মাথায় এই বুদ্ধিটা এল, যে শ্যালকমহাশয়ের মাথায় যখন বিয়ের চিন্তা ঘুরছে, তখন মুখে যাই বলুন, ভেতরে নিশ্চয় কিছু টাকার যোগাড় করে ফেলেছেন আর সেই সঙ্গে তার এটাও মনে হল যে, এই তক্কে অই টাকাগুলোও বাগিয়ে নিতে হবে। রক্ত-লোলুপ বাঘের মত এই অর্থ-লোলুপ আদিত্যচন্দ্র'র চোখ দুটো টাকার চিন্তায় জ্বলে উঠলো!

সে শ্যামাকান্তকে বললে, "আরে সে জন্যে আবার ভাবে ?" শ্যামাকান্ত তখন আগেকার চেয়ে একটু শান্ত হয়ে বললে—"কি রকম বলতো ? তোমার খোঁজে কি স্থবিধে গোছের কনে টনে আছে নাকি ? বেশ কম-সমে হয়ে যায় ?.........তা হলেও হতে পারে, ওসব খবর ত তোমাদের কাছেই আগে পৌছোয় !" আদিত্য তখন মাথা চুল্‌কে বল্‌লে "হ্যাঁ ভাই, একটা পাত্রীর সন্ধান জানি, তা তুমি কি রকম আন্দাজ দিতে পারবে বলত ?

এইখানে তারা কথাটার খুব শক্ত যায়গায় পৌছল।......... শ্যামাকান্তের তহবিলে পাঁচশো টাকা আছে, কিন্তু সে একেবারে সে সত্যটা প্রকাশ না করে' আদিত্যকে বললে "শ দুই তিন"। কিন্তু আদিত্য যখন হতাশ হয়ে তাকেও হতাশ করবার যোগাড় করছে, তখন সে থাকতে না পেরে বললে, "ভাই এই তোমার দিব্যি করে' বলছি, পাঁচশোটাকার এক পয়সা বেশী নাই, যদি এতে বউ যোগাড় করে দিতে পার ত দাও, আমি তোমার কাছে চিরদিন ঋণী থাক্‌বো।".........

'তবে যাদুধন, পথে এস', মনে মনে শ্যামাকান্তকে এইরকম সম্বোধন করে' সে শ্বশুরবাড়ী থেকে বিদায় নিলে। যাবার সময় শ্যামাকান্ত তার দু'টি হাতে ধরে বলে দিলে যেন সে তার কথাটি মনে রাখে, আর দেরী না করে। আদিত্যচন্দ্রও তাকে ভরসা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

খানিকটা গিয়েই তার চিন্তা খুব জমাট বেঁধে এল। সে একবার ভাবলে এতটা দুঃসাহসে কাজ নাই। শেষে ধরা পড়ে গেলে বেদম উত্তম-

মধ্যম খেয়ে, শ্রীঘর পর্য্যন্ত সদ্‌গতি হতে পারে। সে ভয়ে শিউরে উঠল।

কিন্তু পাঁচ পাঁচশো টাকা! সে কি ছাড়া যায়? টাকার কথা মনে হতেই সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়লো। হিতাহিত, উচিত অনুচিত বিপদের চিন্তা সবই তার মাথা হতে উড়ে গেল। সে শুধু ভাবতে লাগল 'টাকা! টাকা! পাঁচ পাঁচশো একেবারে!' 'তারপর আর আমার ল্যাজ ধরে কে, এমন গা-ঢাকা দেবো যে কেউ পাত্তাই পাবে না। কিন্তু তবু এত বড় একটা অন্যায়!' দূর ছাই! এতও আবার ভাবে? টাকা-পাঁচশো!' যখনই তা'র দুষ্ট মতলব শিথিল হয়ে পড়ে তখনই সে টাকার নাম নেয়, অমনি আবার সাহস ফিরে আসে! এমনি করে শেষে সে ঠিক করলে কপালে যা থাকে দুর্গা বলে লেগে যাবে।

তখন একবার খাতাটা খুলে বেশ করে' শেষ পাতার নাম ও ঠিকানাটি দেখে নিয়ে আদিত্য সেই দিকে রওণা হল।

শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে প্রথম দিনটা বুদ্ধিমানের মত কাটিয়ে দ্বিতীয় দিন সে যাবার যোগাড় করতে লাগল। দুপুর বেলা তার স্ত্রী তাকে বললে 'এতদিন পরে যখন দয়া করে এসেছ, এত শীগ্রি যাবে কেন, দুটো দিন থেকেই যাওনা?' বলে' কাতর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

দুলালী

আদিত্যচন্দ্র স্ত্রীকে অসম্ভব রকমে আদর করে' বললে 'তা কি করে' হবে? আমার যে এক শালার বিয়ে পরশুদিন। আমায় অনেক জেদ করে' যেতে বলেছে, নইলে কি আর তোমায় ছেড়ে এত শীগ্রি যাই? আদিত্যের এই কথায় তার স্ত্রী একেবারে গলে' গেল। তখন আদিত্যচন্দ্র গলাটা খুব স্বাভাবিক রকমে কোমল করে' বল্‌লে, 'তা তুমিও না হয় চল না, যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও; ছদিন পরে ফেরবার পথে আমি তোমায় আবার এখানে রেখে দিয়ে যাবো?'

এখন কুলীনের স্ত্রীর কপালে এ রকম সৌভাগ্য একেবারে বিরল। একে ত, বিয়ের সময় ছাড়া সারা জন্ম স্বামীর দেখাই পায় না; তারপর যদি স্বামী আসেন, তা হলে একদিনের বেশী থাকেন না। আর সোহাগ আদর, সেত কল্পতরুর ফলের মত এদের কল্পনাতেই রয়ে যায়।

কিন্তু আদিত্যচন্দ্র স্ত্রীকে যখন এতখানি কৃপা দেখালে তখন সে আনন্দে আটখানা হয়ে অন্যকিছুই ভাবতে পারলে না। ভাবলে শুধু 'তার কি সৌভাগ্য! কুলীনের বউ সে, তবু স্বামী তাকে সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে চাচ্ছেন; তা সে একদিনের জন্যই হোক্, আর ছদিনের জন্যই হোক।……… সে বিনা দ্বিধায় সম্মতি জানিয়ে তার বুড়ো মাকেও সম্মত করে ফেললে।… ……

আদিত্যচন্দ্র নিজের ভাগ্যকে ধন্য মেনে একটা পাল্কীর যোগাড় কর্‌তে চলে গেল।

স্বামী

***　　　***　　　***

তার স্ত্রীর নাম হেমাঙ্গী। তাকে ডাকে 'হেমি' 'হিমি' এমনি অনেক নামে। হেমাঙ্গীকে পাল্কী করে,' আদিত্য তার শ্যালকের বাড়ীতে নিয়ে পৌছল সন্ধ্যার একটু পরেই। সে ভেবে চিন্তেই ঐ সময়ে পৌছ্ল। এসেই সে শ্যামাকান্তের সঙ্গে চুপি চুপি একটা ঘরে বসে অনেকক্ষণ কিসব কথা বার্ত্তার পর বেরিয়ে এল।.........

তারপর কাউকে কিছু না বলে সে রাতারাতি থলিটিকে বেশ করে পেটকাপড়ে লুকিয়ে অন্ধকারে অন্ধকারে একপথ দিয়ে গ্রামের বাইরে চলে এল। তার সুমুখে বিশাল পদ্মা তখন প্রশান্ত হয়ে বয়ে চলেছে ! সে একটা নৌকায় উঠে পড়ল ! মাঝি ঝুপ্ ঝুপ্ দাঁড় ফেলে অন্ধকারে অদৃশ্য হল !

***　　　***　　　***

এদিকে যে ঘরে হেমাঙ্গী বসেছিল, সেখানে তখন দলে দলে মেয়েরা আসতে আরম্ভ করে দিয়েছে। "কই গো, নতুন বউ কই, দেখি," বলে ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েরা এসে তাকে ঘিরে ফেলতে লাগল। হেমাঙ্গী তখন ভাবছে 'আমিই ত শেষের বউ, তাই বোধ হয় সবাই আমায় নতুন বউ বলছে।'.........

এমন সময় মেয়েদের মধ্যে একটা বিস্ময়ের কোলাহল স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেউ বলতে লাগল 'ওমা, বউয়ের মাথায় সিঁদূর কিগো!' কেউ বা বললে 'এত বড় মেয়ে বুঝি বউ!' হেমাঙ্গী যখন অবাক হয়ে তাদের এই রকম সমালোচনা শুনছিল, তেমন সময় সেই মেয়েদের মধ্যে একজন তাকে চিনতে পেরে বলে উঠলো "ও পোড়ারমুখি, ও হিমি, তুই কি করে এলি লো? এঁ্যা!" বলেই সেই মেয়েটি এগিয়ে এসে হেমাঙ্গীর ঘোমটা খুলে ধরল। তখন আর কোন সন্দেহ রইল না।.........এই মেয়েটির বাপের বাড়ী হেমাঙ্গীদের গ্রামেই; ছোট বেলায় তারা দু'জনে 'সই' পাতিয়েছিল, সে হেমাঙ্গীকে খুব চিন্‌ত।

হিমি তখন আশ্চর্য্যি হয়ে বললে "কেন, কি হয়েছে বল্‌ত? আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এসেছি। দাদার বিয়ে—না?"

"ও পোড়াকপালি! হবে লো হবে—তোরই সঙ্গে যে বিয়ে হবার কথা! তোকেই ত তোর স্বামী কনে' বলে দিয়ে গেছে!"

তখন হেমাঙ্গীর মুখ দিয়ে তার স্বামীর উদ্দেশে যে সব কথা বেরিয়েছিল তা' আদিত্যের পক্ষে খুব উপযুক্ত হলেও, না বলাই ভাল। তখন বাড়ীময় গোল উঠল। "খোঁজ শালার জামাইকে"।

কিন্তু জামাই তখন পগার পার! কেউ তার খোঁজ পেল না।

হেমাঙ্গীকে একজন তার বাপের বাড়ীতে রেখে এল।

*** *** ***

শ্যামাকান্ত কামিনী-কাঞ্চন উভয়ই হারিয়ে প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে পড়ল। বছর খানেকের মধ্যে, তার আদিত্যের ওপর রাগটা যখন অনেকখানি কমে এসেছে, তখন কোমর বেঁধে সে আর একবার অর্থ-সঞ্চয়ে মন দিলে। শুনতে পাওয়া যায়, পরের বছরে নাকি নির্বিঘ্নে তার বিয়েটাও হয়ে গিয়েছিল।

* * *　　　* * *　　　* * *

আমাদের বীর আদিত্যচন্দ্র-ও কিছুদিন অমাবস্যায় গা-ঢাকা দিলেন। কিন্তু এই কীর্তিটি তাঁর যশ এত বাড়িয়ে দিয়েছিল যে সাহসে ভর করে' তা'র পূরো পাঁচটি বছর কোথাও উদয় হওয়া ঘটে ওঠে নাই। কিন্তু গড়ানো জলের উদাহরণটা সব যায়গায় সব অবস্থাতেই খাটে। যখন তা'র সমস্ত পুঁজিপাটা শেষ হয়ে এল তখন সে আস্তে আস্তে নিজের অন্যায় বুঝতে পারলে। কতটা নির্লজ্জ পাষণ্ডের মত সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করেছে উপলব্ধি করে মনে মনে খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। ক্রমে ক্রমে অনুতাপে তার বুক ভারী হয়ে এল। ভাবলে যে হয়ত আর বেশীদিন সে বাঁচবে না, অথচ মরার আগে হেমাঙ্গীর কাছে ক্ষমা না চেয়ে সে শান্তিতে মরতে পারে না। তখন সে ঠিক করলে যে হেমাঙ্গীর বাড়ী যাবে, আর যেমন করেই হোক ক্ষমা চেয়ে নেবে।

কিন্তু সে বিলক্ষণ জানত যে প্রতিবেশী বা তার চেনা কেউ যদি তাকে

দেখতে পায় তা হলে সহজে নিষ্কৃতি দেবে না। সেই ভেবে তার ভয়ও হল।.........

পারত্রিক সুখের ব্যবস্থা করতে গিয়ে ঐহিক সুখের ব্যতিক্রমটাও যে বুড়ো বয়েসে মোটেই পৃষ্ঠ-রোচক হবে না তা বুঝেও সে আর একবার দুঃসাহসে ভর করে 'দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়ল!

পাড়াপড়শীরা যখন নিস্তব্ধ হয়েছে, তখন অন্ধকারে এসে আদিত্যচন্দ্র ধীরে ধীরে হেমাঙ্গীদের দরজায় শব্দ করতে লাগল। শব্দ শুনে 'কে গো' বলে হেমাঙ্গীর ভাইটি বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে উঠান পার হয়ে আদিত্য বরাবর ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল। হেমাঙ্গীর সাংঘাতিক অসুখ। প্রদীপের আলোয় তার রক্তহীন মুখচোখ ভূতের মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। এখন যায়—তখন যায় অবস্থা। আদিত্য দেখেই চমকে উঠল।

হাড় ক'খানি টেনে নিয়ে হেমাঙ্গী খাটের একটা কোণে গিয়ে হাঁফাতে লাগল—যেন হঠাৎ ভূত দেখেছে, এমনি করে। আদিত্য তখন সজলচোখে একটু খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে 'হিমি' আমি বড় অন্যায় করেছি, আমায় ক্ষমা কর।' তার মুখ ক্ষণিকের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেই আবার নিষ্প্রভ হয়ে এল। সে খুব দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছিল। অতিকষ্টে বললে, 'তুমি আমায় ছুঁয়ো না, তুমি যাও।' এই বলে সে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আদিত্য এতটা আশা করে নাই। তার এই অবস্থায়, অতিপাষণ্ড, বদমাইশও চোখের জল না ফেলে থাকতে পারে না। সেও পারলে না। সে বড় আশা করে এসেছে—আজ সে ক্ষমা পাবেই, তবে যাবে। তার

অনুতপ্ত মন তখন নুয়ে মাটিতে মিশিয়েছে—চোখের জলে ধুয়ে তা আরও পবিত্র হয়ে গেল। কিন্তু হেমাঙ্গী আর কোন কথাই তাকে বললে না।

শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে আদিত্য একটু পরেই বুঝতে পারলে যে হেমাঙ্গী বেশীক্ষণ বাঁচবে না। সে আবার আকুল হয়ে বলে উঠল 'হিমু, আমি মহাপাপী, তোমায় আমি ছোঁব না, তুমি শুধু একটিবার বলে যাও আমায় ক্ষমা করলে, নইলে মলেও ত আমার শান্তি হবে না!"

অন্তিম নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হেমাঙ্গীর মুখ দিয়ে বা'র হল "ক্ষমা…! আমি কে! স্বামীই না হিন্দু স্ত্রীলোকের দেবতা!"

আদিত্যের কাণে বেজে উঠল কে বল্লে, "অপদেবতা!"

—o—

সেলিনা
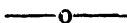
জব্বর শিশুকাল হইতে লতিফের বাড়ীতে মানুষ। তাহার মা তাহাকে কোলে করিয়া পনর বৎসর পূর্ব্বে লতিফের বাড়ীতে চাকরী করিতে আসিয়াছিল ; মাঝে, এক প্রথম বর্ষায় একদিন জ্বর-গায়ে তিন চার ঘণ্টা ভিজার পরে তাহার সর্দ্দি-জ্বর যে কি করিয়া ডবল ন্যুমোনিয়ায় পর্য্যবসিত হইয়া তাহাকে ভবলোকের পরপারে লইয়া গেল, তাহা জব্বরের স্পষ্টভাবে মনে পড়িত না। এখন সে একবিংশবর্ষবয়স্ক যুবক। জব্বর লতিফের ডান হাত। সে গরুর তত্ত্বাবধান করে, ক্ষেতে লাঙ্গল দেয়, বীজ ছড়ায়, বাগান দেখে, প্রয়োজন হইলে গরুর গাড়ীখানা লইয়া ভাড়াও বয়।

লতিফের দুই মেয়ে। দুই জনেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে বিপত্নীক বলিয়া মেয়েদের বাড়ীতে আনার পর্ব্বটা বাদ দিয়াই চলিত। কিন্তু জগতে বেশীর ভাগ সময় আমরা যাহাকে বাদ দিয়া চলিতে চাই, সে-ই নানা ছলে আমাদের সমগ্র পথটা যোড়া করিয়া বসে। লতিফের-ও বড় মেয়ে এক দিন হঠাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার স্বামীকে সাপে কামড়াইয়াছিল—চব্বিশ বৎসর বয়সে সেলিনা বিধবা হইল।

লতিফ লোকটা সর্ব্বাংশে-ই মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে সন্তান-স্নেহ অপেক্ষা অর্থ-লিপ্সা বেশী যায়গা যুড়িয়া ছিল, তাহা যে কেহ নিঃসন্দেহে বলিতে পারিত।

এ দিকে জব্বরের সহিত সেলিনার বেশ বন্ধুত্ব হইল; অবশ্য পূর্ব্ব-বঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমান চাষীদের মধ্যে যেমনটি হওয়া স্বাভাবিক! এক দিন লুব্ধ জব্বর সাহসে ভর করিয়া লতিফের নিকট তাহার কন্যার পাণি-প্রার্থনা করিল। দরিদ্র ভৃত্যের এই স্পর্দ্ধায় সেলিনার পিতার মনের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইল। ক্রোধের সেই গলিত ধাতু-বৃষ্টি হইতে অতি কষ্টে পরিত্রাণ পাইয়া জব্বর সেই দিনই লতিফের বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। জব্বর যে কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী যুবক, তাহা সকলেই জানিত, সে সাধুতাতেও কাহারও অপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট ছিল না; তাহার পক্ষে কায যুটাইয়া লওয়া শক্ত ব্যাপার নহে।

কায পাইয়া অবধি জব্বর অর্থসঞ্চয়ে মন দিল। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল ফলিতে দেরী লাগিল না। জব্বর অল্পসময়েই বেশ কিছু জমাইয়া ফেলিল।

ইতোমধ্যে লতিফ তাহার মেয়ের 'নিকা' দিয়াছে। জব্বর যখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, তেমন সময় এক দিন ঘটা করিয়া তাহার কাণে এই খবরটা পৌছাইয়া দেওয়া হইল। সে দ্বিগুণিত উৎসাহে পরিশ্রম করিতে লাগিল।

সেলিনার নিকা দেওয়া হইল বটে, কিন্তু বৃদ্ধ ইসমাইলকে কেবল

তাহার অর্থের জন্য ভালবাসা, তাহার বয়সের মেয়েদের পক্ষে সুধু অসম্ভব নয়, অস্বাভাবিক। তাহার মন পড়িয়া রহিল, সুন্দর-সুগঠিত-দেহ যুবক জব্বরের নিকট।

পদে পদে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অবহেলা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তেমন সময় এক দিন রাগের মাথায় ইসমাইল বলিয়া ফেলিল, "যে মেয়ের ওপর বাপের দরদ নাই, সে আর কত ভাল হবে। এমনই ছেনাল বলেই ত লতিফ তোকে বিদেয় ক'রে বেঁচেছে।" এই কথা বলায় সেলিনা যাহা নয় তাই বলিয়া তীব্রভাষায় ইসমাইলকে সমস্ত দিন এমন গালাগালি করিল যে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ইসমাইল তাহাকে 'তালাক' দিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

আবার এক অন্ধকার শ্রাবণ-সন্ধ্যায় লতিফের বন্ধদ্বারে ক্রন্দনরতা সেলিনার মৃদু হস্তের করাঘাত পড়িল। সমস্ত শুনিয়া লতিফের-ও রাগ হইল। সে বলিল, "বেশ হয়েছে, থাক্ তুই ঘরে।" এই হতভাগ্য মেয়েটাকে সে একটু ভালই বাসিত। কিন্তু মেয়েকে যতই ভালবাসুক ও তাহাকে মুখে যতই স্ব-গৃহবাসিনী হইবার জন্য অনুরোধ করুক, যখন সদ্য-সমৃদ্ধ জব্বরের নিকট হইতে সেলিনাকে নিকা করিবার প্রস্তাব আবার আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর লতিফের চক্ষুতে যত দূর দৃষ্টি যায়, বাধা বলিয়া কোন কিছু নয়নগোচর হইল না। রজত-চক্রের এমনই মাহাত্ম্য যে, দুর্গমতম পথ-ও তাহার অনতিক্রমণীয় থাকে না; এ চক্রের গতিরোধ করে, এমন বাধা পৃথিবীতে দুর্লভ! সেলিনার মনোভাব

লতিফের অজ্ঞাত ছিল না, এবং বিনা ঘটায় এক দিন সেলিনার সহিত জব্বরের নিকা হইয়া গেল।

* * *

এখন নিজের নূতন সংসারে প্রবেশ করিয়া সেলিনার মনে হইল, এই বুঝি তাহার প্রথম বিবাহ। সে পূর্ণোদ্যমে ঘর-সংসার গুছাইতে লাগিল। অক্লান্ত পরিশ্রমে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে অবিশ্রান্তভাবে জব্বরের অর্থাগমের উপায় করিয়া দিত। সকালে গৃহকর্ম্ম করিয়া, স্বামীর পাজালীতে আগুন দিয়া, তাহার কাপড়ে গুড়-মুড়ি বাঁধিয়া দিয়া সে স্নান করিতে যাইত। তাহার পর রান্না-বাড়া হইলে দারুণ রৌদ্রকে অগ্রাহ্য করিয়া মাঠে জব্বরের জন্য একটা জামবাটিতে শান্‌কী ঢাকা দিয়া ভাত লইয়া যাইত। জব্বরের খাওয়া হইলে নিজের হাতে যত্ন করিয়া তাহার তামাক সাজিয়া দিত ও যতক্ষণ জব্বর তামাক টানিত, ততক্ষণ সে আপনার করণীয় কাযগুলি তাহার কাছে শুনিয়া লইত। বাড়ী গিয়া তাড়াতাড়ি দুটা মুখে দিয়া সে জব্বরের দেওয়া কাযগুলি করিতে বসিয়া যাইত। এইরূপে এক বৎসর গেলে তাহার একটি পুত্র হইল।

* * *

সে বৎসর জব্বর আচার্য্য মশাইয়ের অনেকটা জমী 'ভাগে' লইয়াছিল; তাহাকে সেই জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। একলা পারিয়া উঠিত না বলিয়া লোকজনও রাখিতে হইয়াছিল। তাহার উপর

সেইবারই সে দেড়শত টাকা দিয়া একযোড়া ভাল চাষের বলদ কিনিয়াছিল। পুঁজি-পাটা যাহা ছিল, সবই প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তবে আশানুরূপ ফসল হইলে যে এই সমস্ত খরচ সুদেমূলে দ্বিগুণ হইয়া ঘরে উঠিবে, তাহা সে জানিত। কিন্তু হঠাৎ সেলিনার খুব অসুখ হইল। তাহার জ্বর আর ছাড়ে না। জব্বরের কাযের ক্ষতি ও অসুবিধা হইতে লাগিল; রুগ্ন সেলিনার দেখাশুনা করে, এমন লোক তাহার কেহ ছিল না, তাই তাহাকে ও চার বৎসরের পুত্রটিকে সে কতক দিনের জন্য লতিফের বাড়ীতে রাখিয়া দিবে ঠিক করিল।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর কর্ম্মান্তে বিশ্রাম না করিয়াই সে লতিফের বাড়ী যাইত ও সেলিনার জন্য কিছু ঔষধ, পথ্য ও ফলমূল সঙ্গে লইত। এ দিকে লতিফ প্রত্যহ ডাক্তার ডাকিয়া মেয়ের রীতিমত চিকিৎসা করাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, তাহার পয়সা দিতে হইত জব্বরকে। স্ত্রীর অসুখে রোজই পাঁচ ছয় টাকা খরচ হইতে লাগিল।

এক দিন অনেকগুলা টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। জব্বরের মনটা তত ভাল নাই। তাহায় উপর স্ত্রীর এই একটানা অসুখের মধ্যে সারিয়া উঠার কোন চিহ্নই না দেখিতে পাইয়া তাহার সহিষ্ণুতা নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। সে শূন্য হাতে লতিফের বাড়ী ঢুকিল। তাহার ছেলেটা রোজ যেমন করিত, সে দিন-ও 'বাবা, বাবা' বলিয়া ছুটিয়া যেমন তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া উঠিতে যাইবে, জব্বর তাহাকে রূঢ়ভাবে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল।

লতিফ, জব্বরকে দেখিবামাত্র বলিল যে, ডাক্তারবাবু একটা কি "ইন্‌জিসিন্" (Injection) করিয়াছেন, তাঁহাকে ভিজিট বাদে আরও দুই টাকা দিতে হইবে ও এরূপভাবে আরও ছয় দিন দুই টাকা করিয়া লাগিবে। এতক্ষণ ধরিয়া নানা কারণে জব্বরের মনটা বিরক্ত হইয়াছিল; কিন্তু 'ঝাল ঝাড়িবার' পাত্রের অভাবে সে চুপ করিয়া ছিল। লতিফের এই কথায় তাহার ক্রোধের বাঁধ ভাঙিয়া গেল ও সমস্ত তিক্ততা-তীব্রতা গিয়া পড়িল লতিফের উপর। লতিফ-ও রাগে কাহার-ও নিকট খাট নয়। সে-ও বলিল যে, যাহার স্ত্রীর অসুখের ব্যয় বহন করিবার সামর্থ্য নাই, তাহার আবার বাহাদুরী করিয়া বিবাহ করিতে যাওয়া কেন? কথায় কথা বাড়ে। রাগের মাথায় জব্বর-ও এমন সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল, যাহা সে কখনও বলিতে পারে বলিয়া ভাবে নাই। বাদানুবাদের উত্তেজনায় হার স্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে ও তখন মুখ দিয়া এমন সমস্ত কথা-ও বাহির হইয়া যায়—যাহা পরে কেহ শুনাইয়া দিলে নিজের কথা বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। পরিত্যক্তা ও বিতাড়িতা সেলিনাকে জব্বর যে দয়া করিয়া স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছে, এই কথাটাও তাহার মুখ দিয়া সেইরূপে বাহির হইয়া গিয়াছিল। একটা মিথ্যা-ও ইহার সহিত যুক্ত করিয়া জব্বর নিজের মহত্ত্ব ও সেলিনার ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণিত করিয়া দিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, সেলিনা তাহাকে নিকা করিবার জন্য কাকুতি-মিনতি করে ও সেই জন্য লতিফের বরং কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ইহার পর যাহা হয়, তাহাই হইল। লতিফ উষ্ণভাবে জানাইয়া

দিল, তাহার কৃতজ্ঞ হইতে দায় পড়িয়াছে। জব্বরের মত জামাই তাহার চাকর হইবার-ও উপযুক্ত নয়। এই কথায় জব্বরের হৃদয়ের একটা ক্ষতস্থানে নূতন করিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল। সে আর সহ্য করিল না; ছেলেটাকে কোলে লইয়া সটান লতিফের বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, যেন সেলিনাকে তাহার বাড়ী পাঠান না হয়।

সে বৎসর ফসল ভালই হইল। জব্বর আশানুরূপ অর্থলাভ করিল। এইবার সে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ও সংসারের দিকে মনোনিবেশ করিবে ভাবিল। সে ভুলিয়া-ও লতিফের বাড়ীর দিক্ মাড়ায় না বা ছেলেটাকে-ও সেই দিকে পাঠায় না। জোর করিয়া সে এইবার সেলিনার স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু মনোরাজ্যের নিয়ম এমন-ই অদ্ভুত যে, সেই দিন হইতে-ই সেলিনার স্মৃতি যেন তাহাকে বিশেষভাবে পাইয়া বসিল! এত দিন এক রকম ছিল ভাল। কায-কর্ম্মের মধ্যে মনোবৃত্তির হাঙ্গাম প্রবেশ করিবার ছিদ্রই পাইত না। কিন্তু ক্ষেত্রের ফসল ঘরে আসার পর যে হতভাগ্য কৃষকের সংসারে মন খুলিয়া আনন্দের ভাগ লইবার লোক থাকে না, তাহার শস্যসম্ভার, তাহার পরিপূর্ণ মরাই-খামার তাহাকে কোন সুখই দিতে পারে

না। শুভ-নবান্ন তাহার ব্যর্থ হইয়া যায়! জব্বরের-ও শ্রমজল সফল করিয়া যখন এই অসম্ভাবিত শস্য উৎপন্ন হইয়া তাহার প্রচুর অর্থাগমের পথ খুলিয়া দিল, তখন তাহার কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। শস্য ঘরে উঠিলে যতটা আনন্দ হইবে বলিয়া সে আশা করিয়াছিল, সে আনন্দের কিছুই যখন সে অনুভব করিতে পারিল না, তখন সে হতাশ হইয়া পড়িল। শূন্য উঠান, শূন্য ঘর, শূন্য হৃদয়—সে অনন্ত শূন্যতার মধ্যে আপনাকে অসহায় বোধ করিতে লাগিল। তাহার পর ছোট ছেলেটা—তাহার অগণিত আবদার-ঝঞ্ঝাটে ক্লান্তি আসিত না বটে, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে সেলিনার খুটি-নাটি স্মৃতিগুলিকে এমন ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইয়া রাখিয়াছিল যে, জব্বর যে চিন্তা মন হইতে দূর করিতে চাহিত, সেই চিন্তাই জীবন্ত শক্তিতে তাহার মনোমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হইতে লাগিল। শেষে লতিফের প্রতি রাগটাই জব্বরের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তাহাকে শাস্তি দিতেই হইবে।

এই শাস্তির সে এক অদ্ভুত উপায় ঠিক করিল। অনায়াসে এক পাত্রী সংগ্রহ করিয়া অনাড়ম্বরে সে তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। কিন্তু হায়, এ বিবাহে তাহার অন্তর-মন যোগ দিল না; এ বিবাহ করিয়াছিল তাহার ক্রোধ, তাহার ভ্রান্ত আক্রোশ! সে দেখিল, না, যে শূন্যতা তাহাকে দিবারাত্র উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল, তাহা ইহার দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে। এমন কি, ছেলেটা-ও ইহার মধ্যে কোন আশ্রয় খুঁজিয়া

পাইল না। জব্বরের অন্তরাত্মা এই নিষ্ফলতা উপলক্ষ্য করিয়া অহোরাত্র তাহাকে জ্বালাইয়া তুলিল। এ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি হইতে দেরী লাগে না বা সে দেরীটুকু সহ্য-ও হয় না। এক এক দিন নিঝুম সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসিয়া উঠানের স্ফীত মরাইগুলার দিকে চাহিতে চাহিতে জব্বরের বিষণ্ণ অবসন্ন মন যেন শোকরাজ্যের কোন্ দুর-দুরান্তরে চলিয়া যাইত; দুইটি প্রীতি-মঞ্জুল চক্ষু স্মরণ করিয়া তাহার বিশাল বক্ষ অশান্ত দীর্ঘশ্বাসে নাড়া দিয়া উঠিত; অসীম বেদনাময় ক্রন্দন আলোড়নে তাহার সমগ্র হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিত!

শীঘ্রই এই নব-পরিণীতার সহিত জব্বরের এক দিন মনোমালিন্য ঘটিল; প্রায় অকারণেই এবং সহসা সে তাহাকে ‘তালাক’ দিয়া তাড়াইয়া দিল, কিন্তু তাড়াইয়া দিয়া বেশী দিন চলিল না। পরিবর্ত্তনের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, সে পুনরায় আর এক জনকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল। কিন্তু পাড়ার লোকরা সবিস্ময়ে দেখিল যে, জব্বর তাহাকে-ও অল্পদিন পরেই তাড়াইয়া দিল।

এক দিন শূন্যগৃহে ছেলেটাকে কোলে করিয়া জব্বর সন্ধ্যাকাশের স্পন্দমান তারকারাশির দিকে নিস্পন্দ নয়নে চাহিয়া যখন মনটাকে একান্তই বিশ্রী করিয়া ফেলিয়াছে, তেমন সময় কি খেয়ালের বশে সে

হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "খুশ্রু বাপ, মা'র কাছে যাবি?" এক হাতে পিতার গলাটা আরও নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া অপর হাতখানা মুখে পূরিয়া ম্লান দৃষ্টিতে সে পিতার সজল চক্ষুর দিকে চাহিল ও নীরবে মাথাটি একবার খুব খানিকটা হেলাইয়া মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

পরদিন সন্ধ্যায় লোকজন লইয়া জব্বর লতিফের বাড়ী হাজির হইল। গিয়া বলিল যে, সে সেলিনাকে লইয়া যাইবে। লতিফ প্রচণ্ডভাবে রুখিয়া বলিয়া উঠিল, সে ছোট লোকের বাড়ীতে মেয়ে পাঠাইতে রাজী নয়। কিন্তু আজ তাহার এই অস্ত্র তীক্ষ্ণতা-হীন হইয়া পড়িল। আজ জব্বর সঙ্কল্প স্থির করিয়া, মনকে ভালরূপে যাচাই করিয়া আসিয়াছিল। সে জোর করিয়া সেলিনাকে লইয়া গেল।

জনবলে হীন থাকায় লতিফ কিছু করিতে পারিল না। ব্যর্থ ক্রোধে ফুলিয়া লতিফ জব্বরকে জানাইল যে, সে কত বড় মরদ, পরে দেখিয়া লইবে এবং কন্যাকে অভয় দিয়া বলিল যে, সে পরে তাহাকে তাহার পাষণ্ড স্বামীর কবল হইতে উদ্ধার করিবে।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে যথেষ্ট লোকজন লইয়া লতিফ বিপুল আয়োজন সহকারে জব্বরের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। বাড়ীতে তখন জব্বর ও সেলিনা ভিন্ন কেহ ছিল না। হঠাৎ লতিফ ও তাহার লোকদের হুঙ্কারে জব্বর তাহার প্রকাণ্ড লাঠিটা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। একটা রক্তারক্তি যখন নিতান্ত আবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে, তেমন সময় সেলিনা কোথা হইতে আসিয়া স্বামীকে টানিয়া গৃহমধ্যে

লইয়া গেল। পরিশেষে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, সে স্বেচ্ছায় জব্বরের সহিত আসিয়াছে ও এইখানেই থাকিবে; পিতৃগৃহে যাইবার তাহার কোন আগ্রহ-ই নাই। বিপুল বিস্ময়ে লতিফ তাহার এই নূতন অভিজ্ঞতা স্তম্ভিতভাবে পরিপাক করিল।

—o—

পঙ্কজ
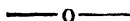
সিরাজগঞ্জ, যমুনাসৈকতে অবস্থিত একটি সুরম্য সহর। যে যায়গায় আমরা থাকিতাম, সেটাকে ঠিক সহর বলা চলে না। যমুনার শুভ্র বালুকাঞ্চল ধরিয়া যেন কতকগুলি গৃহ-শিশু ক্রোশের পর ক্রোশ চলিয়াছে। ইহারা যেন কলহের ভয়ে পরস্পরের নিকট হইতে পরস্পর সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইরূপ একটি বাড়ীতে আমরা বাস করিতাম। আমার পড়িবার ঘরের জানালা খুলিলেই একটি স্বল্প-পরিসর গলির অপর পার্শ্বস্থিত বাসাবাড়ীটা সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হইত। এই বাড়ীটাই সে অঞ্চলে ছোট'র মধ্যে বেশ সুদৃশ্য। দিন কয়েক খালি থাকিবার পর একজন স্বাস্থ্যান্বেষী ভাড়াটিয়া সেই বাড়ীটি দখল করিল।

আমার সেবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা—সিরাজগঞ্জে দাদা ও বৌদি' থাকিতেন। পড়াশুনার সুবিধা হইবে বলিয়াই এখানে থাকা। যায়গাটাও বেশ স্বাস্থ্যকর। পড়াশুনার মাঝে মাঝে যে অকারণ-কৌতূহল, ওস্তাদ পড়ুয়ার মত সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই ছুটি লইয়া পলাইত। তাহার কৃপায় এই ভাড়াটিয়া পরিবারের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বাড়ীর কর্ত্তার বয়স ২৮ কি ২৯; কিন্তু চেহারা কঙ্কাল-সার। মুখ, শবের মতন সাদা, পায়ের স্ফীতি ভীতিপ্রদ আকার

ধারণ করিয়াছে ; রোগ থাইসিস্ না হাঁপানি গোছের একটা কি হইবে। ইহার উপর তিনি বিবাহিত ও ছয় বৎসরের একটি পুত্র বর্ত্তমান। তাঁহার সেবাপরায়ণা স্ত্রীও সঙ্গে আসিয়াছেন ; তাঁহার বয়স ২০ কি ২১ বৎসর হইবে। ইঁহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য আর একজন আত্মীয় যুবক সঙ্গে আছেন। এই কয়জন প্রাণী লইয়াই এই ক্ষুদ্র পরিবারটি গঠিত।

* * *

দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিল। বৌদি' এক দিন বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন ; বাড়ীতে রহিলাম আমি ও দাদা। দাদা সমস্ত দিনই কাযের জন্য বাহিরে থাকিতেন ; শরৎকালের রৌদ্র-হসিত দুপুর বেলাটা খানিক পড়াশুনা করিয়া,খানিক বা ঠাকুর চাকরের সহিত গল্পগুজবে কাটাইতাম। বিকালের দিকে ফুটবল ছিল। দিনগুলি একরকম মন্দ কাটিতেছিল না। মাঝে মাঝে সেই প্রতিবেশী ভাড়াটিয়াদের কার্য্যকলাপও দৃষ্টিগোচর হইত। পড়িবার ঘরের জানালা খুলিলেই দেখিতাম, ছোট ছেলেটি উঠানে একটা বাঁশের কাঠি দিয়া গর্ত্ত খুঁড়িতেছে, বোধহয় পুষ্করিণী খনন করিবার আশায় ; নয়ত এক হাতে একটা খবরের কাগজ ও বগলে নারিকেল কাঠির ঝাঁটা লইয়া মাতার নিকট খানিকটা ময়দার আঠার জন্য জুলুম যুড়িয়া দিয়াছে। ঘুড়ি-ওয়ালাকে অনর্থক একটা পয়সা না দিয়া সে এইরূপে নিজের অজ্ঞাতে স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতেছিল। কোনদিন

দেখিতাম খোকার জননী, স্বামীর গায়ের ফ্লানেল জামাগুলি সযত্নে একটি একটি করিয়া করিয়া শুকাইতে দিতেছেন ; কখনও বা দেখিতাম একহাতে একটা কাগজের ঠোঙ্গায় স্বামীর কফ্‌-গয়ের ধরিতেছেন ও অপর হস্তে করুণামাখা ম্লান মুখে ঘর্ম্মাক্ত স্বামীর মাথায় বাতাস করিতেছেন। হয়ত আবার চোখে পড়িত, জ্যোৎস্নারাত্রি—তিনি সিঁড়ির উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন, ও উপরে বারান্দায় অনুজ্জ্বল প্রদীপের আলোকে পৃথক্ পৃথক্ শয্যায় স্বামী ও পুত্র নিদ্রিত। যাহা হউক, প্রায়ই চোখে পড়িত এই সেবাপরায়ণা রমণীটি স্বামীকে লইয়া একান্ত বিব্রত হওয়া সত্ত্বেও হাসিমুখে, নীরবে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে প্রত্যেক কাযটি করিয়া যাইতেছেন। বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক সেই আত্মীয়-যুবকটির মুখে প্রায়ই সংবাদ পাইতাম রোগীর অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না।

সেদিন যখন ফুটবল খেলিয়া ফিরিতেছি, বাড়ীর কিছুদূর হইতে রমণীকণ্ঠের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলাম। বাড়ীর কাছে আসিতেই দেখিলাম, পাড়ার সব্‌ইনেস্‌পেক্টর বাবুর ঝি সেই ভাড়াটীয়াদের বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে। জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "আহা বাবু, এইমাত্র রুগিটা মারা গেল ; মেয়েটি যা কাঁদ্‌ছে—কাছে

দাঁড়ানো যায় না।" ছুটিয়া পড়িবার ঘরে আসিলাম; জানালা খুলিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। ঐ রমণীটির পৃথিবীর একমাত্র অবলম্বন যে নিদারুণ নিয়তির লীলায় অকস্মাৎ ভূমি-চুম্বন করিল তাহা তাঁহার উন্মত্ত-বিলাপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইলাম প্রতিবেশীদের সহানুভূতি দেখিয়া। কাণে গেল, সব্-ইনেস্পেক্টর-গৃহিণী ঝিকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন, "বুড়ী মাগী, তুই কোন্ আক্কেলে কি ছোঁয়াছে রণ্ডীর মড়ার কাছে গেস্‌লি? কাপড় ছাড়্, গঙ্গাজল নে; খবরদার ও বাড়ী যাস্‌নে।"

কাছাকাছির মধ্যে আর কাহারও বাড়ী ছিল না। সেইজন্য বলা বাহুল্য, এই বিপন্ন প্রবাসী পরিবারের গৃহে কাহারও পদধূলি পড়িল না।

রাত্রি প্রায় আটটা হইবে, চন্দ্র উঠিল; পৌষের শেষ। নদীর কন্‌কনে হাওয়া মোটা জার্সির মধ্য দিয়াও শীতের কম্পন আনিতেছিল। বেশ শিশির পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। জানালা দিয়া দেখিলাম, স্ত্রীলোকটি স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে উবুড় হইয়া পড়িয়া 'মড়া-কান্না' কাঁদিতেছেন ও শিশুটিও কিছু বুঝিতে না পারিয়া মাকে কাঁদিতে দেখিয়া মাঝে মাঝে 'মা—গো,—মা—' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

কখনও বা সে থামিয়া, মায়ের মুখটি দুইহাতে তুলিয়া বলিতেছে, "মা কেঁদোনা ;" কিন্তু কিছুতেই মাকে থামাইতে না পারিয়া পুনরায় অভিমান-ভরে মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছে। কিন্তু তাহার অভিমান ব্যর্থ হইতেছে ; মাতা একবার তাহার দিকে ফিরিয়াও দেখিতেছেন না। যে যুবকটি ইঁহাদের দেখাশুনা করিতেন তিনি অস্থিরভাবে ঘর-বাহির করিতেছিলেন। বুঝিলাম কি করিয়া সৎকারের লোকজন যোগাড় হইবে ইনি তাহারই হতাশজনক চিন্তাটাকে ক্ষিপ্র পদচারণের বেগের মধ্যে ডুবাইতে চাহেন। বাস্তবিকই এই অসহায় বিপন্ন পরিবারের অবস্থা দেখিয়া এক একবার সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইল ছুটিয়া গিয়া যুবককে বলি—চলুন আমরা দুজনেই শব শশ্মানে নিয়ে যাই। কিংবা খোকাকে কোলে করিয়া ভুলাইয়া শান্ত করি। রমণীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব ?—কিন্তু এর কোনটিই করিতে পারিলাম না। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকের মধ্যে ঐ রমণী একেলা বলিয়াই হউক বা বাড়ীর মধ্যে আমার সমবয়সী কেহ নাই বলিয়াই হউক, এই প্রতিবেশীদের গৃহে কখনও পদার্পণ করি নাই। দাদা বাড়ী নাই, তাঁহার অমতে সংক্রামক ব্যাধি-দুষ্ট গৃহে আমার যাওয়া সঙ্গত কিনা তাহা ভাবিয়া উঠিতেই পারিলাম না। বিশেষতঃ, চিরন্তন সহচর লজ্জাশীলতা ও সঙ্কোচ এমনইভাবে আমার চিত্তকে সেই সময় অধিকার করিয়া রহিল যে, ইচ্ছাসত্ত্বেও কোন-রূপে সেখানে গিয়া সহানুভূতি দেখাইতে পারিলাম না। এইভাবে সময়

কাটিয়া চলিল; রাত বাড়িতে লাগিল। অম্লান জ্যোৎস্নালোকে চতুর্দ্দিক প্লাবিত। রাত্রির শিশির, কোন্ সমব্যথিতের অশ্রুবিন্দুর মত ঘাসে, গাছের পাতায়, টল্‌মল্ ঝল্‌মল্ করিতেছিল! মাঝে মাঝে কাহার পাঁজর-ভাঙা হুহু-শ্বাস যমুনা পুলিন হইতে, একইভাবে বহিয়া আসিয়া বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল!·········

***   ***   ***

"শ্মশান-বাসিনি শ্যামা!············"

রাত বোধ হয় দেড়টা! বুঝিলাম হরিশমামা এইবার তাহার নিশীথ-লীলা শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। হরিশমামার কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। তিনি বৃদ্ধত্বের দরজায় পা দিতে বসিয়াছেন; বয়স পঞ্চাশ, কিঞ্চিৎ পানদোষ ও আনুষঙ্গিক দুই একটা ত্রুটি বর্ত্তমান। মাথায় টাক; বয়সের অনুপাতে শরীর বলিষ্ঠই ছিল—মাল ওজনের কায করিয়া 'জেটি' হইতে রোজ রাত্রি আটটায় ছুটি পাইতেন। তাহার পর আড্ডায় বসিয়া কারণসুধাপান ইত্যাদিতে কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া প্রত্যহই রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, কি অমাবস্যা, কি পূর্ণিমা, সকল ঋতুতে একইভাবে শ্যামাবিষয়ক কোন না কোন গানের একটা কলি গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিতেন। বাড়ী বলিতে কেবল একটি বাড়ী-ই তাঁহার ছিল। তিনি ছাড়া তাহাতে দ্বিতীয় জনমানব থাকিত না।

রাত্রি দেড়টার সময় তালা খুলিয়া একটা মাদুরে শরীর ঢালিয়া দিয়া পৌষ ও বৈশাখে সমভাবে 'কোঁচার টেপ্' গায়ে, গান গাহিতে গাহিতে হরিশমামা শেষ রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। তিনি আবাল-বৃদ্ধ সকলেরই মামা; এ রকম সাধারণ-সম্পত্তি জগতে বিরল নহে। মাতালদের যে চমৎকার গুণটি থাকে ইনি তাহা হইতে বঞ্চিত ত ছিলেনই না বরং তাহার আতিশয্যই তাঁহাকে সকলের কাছে প্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল।········ অর্থাৎ সামান্য ৪৫৲ টাকার 'মাল-ওজন-বাবু' হইলেও তাঁহার মেজাজ ও হৃদয় ইরাণের বাদ্শা অপেক্ষা কোন অংশে কম 'দিলদরিয়া' ছিল না। সময়ে, অসময়ে, তাঁহাকে গিয়া বল, তিনি সব কাযেই রাজী; বিশেষ করিয়া যদি তাহাতে কাহারও কোন উপকার করা হয়।·········

শুভ্র কাঁকরের রাস্তাখানি যমুনার ধার দিয়া, শুভ্র-ভস্ম-ভূষণ ভোলানাথের মতই, যেন জ্যোৎস্নালোকে ধূলির আসন পাতিয়াছিল! মাঝে মাঝে দুই এক কুচা অভ্রের উপর চন্দ্রালোক পড়ায় তাহা চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছে! উদাস বাতাস হু-হু শব্দে যমুনার নীল-বক্ষ হইতে কি হতাশের বাণী প্রতিনিয়ত বহিয়া আনিতেছিল!

*** *** ***

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দেখিলাম হরিশমামা ক্রন্দন শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া ডাকিলেন, "রমেশবাবু!"

যুবকটি বাহির হইয়া আসিলেন; তাঁহার সঙ্গে দাদাও ছিলেন, তাঁহাদের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হরিশমামা যে দিক হইতে আসিয়াছিলেন সেই দিকেই ফিরিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের আড্ডা হইতে আরও একজন সঙ্গী যুটাইয়া সকলে মিলিয়া শব বাড়ীর বাহিরে আনিলেন। বিধবার হৃদয়-বিদারক বিলাপ সকলকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল। 'হরিবোল' ধ্বনি করিতে করিতে সকলে শব শ্মশানে লইয়া চলিলেন; তখন রাত্রি ৩টা!

দুঃখ-দুশ্চিন্তার গুল্মজাল আমায় নিবিড় ও জটিলভাবে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারই অস্বস্তিকর আবেষ্টনীর মধ্যে কখন নিদ্রা-কর্ষণ হইয়াছে জানি না—একটা চাপা কান্নায় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিতেই দেখিলাম জানালা খোলা-ই আছে, বিছানা না পাতিয়া আমি দোয়াত কলম ও বইয়ের মাঝেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সমস্ত রাত জানালা দিয়া হিম ও ঠাণ্ডা হাওয়া আসায় কয়েক ঘণ্টাতেই সর্দ্দি করিয়া গিয়াছে। তখনও ভাল করিয়া সকাল হয় নাই। ও বাড়ীতে তখনও স্ত্রীলোকটি মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন; কিছুক্ষণের জন্য আবার সমস্ত নিস্তব্ধ। এই ক্রন্দন যেন তাঁহার বক্ষপঞ্জরের বহু নিম্ন হইতে অনেক-ক্ষণ পরে পরে পথ করিয়া লইতে সমর্থ হইতেছিল! ছেলেটির মাথা সোপানের শেষ ধাপে ও দেহটি সমস্তই উঠানে! সে ঐ ভাবেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আমি চমকিয়া উঠিলাম। সমস্ত রাত্রির শীত ও শিশির এই শিশুর

গায়ে লাগিয়াছে—তথাপি তাহাকে কেহ উঠাইয়া ঘরে শোওয়ায় নাই! তখনও শবদাহ করিয়া কেহ ফেরেন নাই, সুতরাং বাড়ীতে যুবকটিও ছিলেন না যে, কোন ব্যবস্থা হইবে। গভীর বিষাদ বাড়ীটির সমস্ত অঙ্গ অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিল।

অল্পক্ষণ পরেই শীতের কুয়াসা-যবনিকার অন্তরালে দুষ্টামির উজ্জ্বল হাসি হাসিয়া পূর্ব্বাকাশে অরুণদেব দেখা দিলেন। কোথাও বা তখনও আলো পৌঁছায় নাই; সেখানে কুয়াসা তখনো তাহার ধূম্রস্বরূপ অপ্রতিহত রাখিয়াছে। দু' একটা কাক রৌদ্রের খোঁজে, বাড়ীর ছাদে ছাদে ও গাছের এক ডাল হইতে অন্য ডালে যাইতেছিল। তখনো ইন্সপেক্টর বাবুদের বাড়ীর দরজা বন্ধ; তিনটি গরাদের একটা ম্লান ছায়া সৃষ্টি করিয়া নবারুণ সেখানে বৃথাই প্রবেশভিক্ষা করিতেছিল। পূর্ব্বদিন পৃথিবীতে যে ভাবে প্রভাত হইয়াছিল আজও প্রায় সেই-ভাবেই প্রাতঃকাল আসিয়াছে, কিন্তু মানুষের কাছে তাহার মধ্যে কত প্রভেদ ছিল! পাশের বাড়ীর দিকে আর চাওয়া যায় না; ভাবিতেছিলাম এই সঙ্কট হইতে কে আসিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইবে?

কিছুক্ষণ পরে সেই পথ দিয়া দুইজন বারাঙ্গনা বোধহয় নিশীথাভি-সারের পর নিজেদের গৃহে ফিরিতেছিল। স্ত্রীলোকের বুকফাটা ক্রন্দনে

তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর দরজা খোলা—সেখান দিয়া ঘরের ও ভিতরের বারান্দার খানিকটা দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। তাহারা কিছুক্ষণ কৌতূহলবশে সেখানে দাঁড়াইয়া অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিল; পরস্পরের মধ্যে কি একটা বলাবলি করিয়া অবশেষে দু'জনেই খোলা দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।.........

তাহার পর কি আশ্চর্য্য ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত-ই না তাহারা বিষাদের ও বিশৃঙ্খলতার সহিত যুদ্ধ যুড়িয়া দিল! মায়ের মতন যত্নে একজন শিশুটিকে সন্তর্পণে 'আহা—বাছা' বলিয়া কোলে তুলিয়া লইল। তারপর নিজের গায়ের শালখানি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিল। আর একজন রমণীটির কাছে গিয়া তাঁহাকে নানা প্রবোধ-বাক্যে, উপস্থিত-কর্ত্তব্যের মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল। শুনিলাম, সে বলিতেছে, "মা, ছেলেটা যে সমস্ত রাত হিমে পড়ে' কালিয়ে গেছে! আহা, তাকে এখন তুমি না দেখ্‌লে কে আর দেখ্‌বে বল? ঐটিই এখন তোমার স্বামীর চিহ্ন, মা; ওকে যত্ন কর।" রমণী প্রথমে জড়বৎ কথা কয়টি শুনিয়া গেলেন যেন কিছু বুঝিতে পারিলেন না; তারপর ধীরে ধীরে যখন সমস্ত উপলব্ধি করিলেন তখন 'কই, খোকা কই!' বলিয়া উন্মাদিনীর মত চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। তখন অপর স্ত্রীলোকটি উঠানের এক কোণে আগুন জ্বালিয়াছে ও তাহার গায়ের ফ্লানেলের জামা খুলিয়া ছেলেটির গায়ে তাপ দিতেছে। তাহারা সদ্যোবিধবা রমণীকে সেই আগুনের ধারে লইয়া আসিল ও তাঁহার গায়ে নিজেদের শালখানি

জড়াইয়া দিয়া নিজেরা সেই প্রচণ্ড পৌষের শীতে ভোর বেলায় হি-হি করিতে লাগিল।

শবদাহ করিয়া দাদা ও রমেশবাবু ফিরিলেন। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া আমাদের বৈঠকখানা ঘরে তাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন—বোধহয়, অতঃপর কি কর্ত্তব্য সেই বিষয় রমেশবাবু, দাদার পরামর্শ লইতেছিলেন। বেচারা, বিদেশে এই অসহায় স্ত্রীলোক ও শিশুকে লইয়া কি করিবেন তাহা কল্পনা করিয়াই যেন মুশ্‌ড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। কক্ষান্তর হইতে শুনিলাম, শেষে এই সাব্যস্ত হইল যে বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়া তারপর দিন সকালবেলার ষ্টীমারে তাঁহারা সকলে দেশ রওণা হইবেন। এভাবে সিরাজগঞ্জে আর তাঁহাদের থাকা চলে না। কেন না রমেশবাবুর সম্মুখে স্ত্রীলোকটি বাহির হইতেন না, বা তাঁহার সহিত কথা কহিতেন না—এ অবস্থায় এখন আর একদিনও চলা অসম্ভব।·········তারপর তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, কে-ই বা বিধবার বেশ পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিবে; তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় যে সব সংস্কার, আচার ইত্যাদি পালনীয়, কে-ই বা সে সব করাইবে—কি করিয়া তাঁহার মুখে হবিষ্যান্ন যাইবে তাহার-ও কোন উপায় তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না।·········

এধারে দেখিলাম সেই স্ত্রীলোকরা বিধবাকে কিছুক্ষণ আগুনের উত্তাপ

দিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উঠানে রৌদ্র আসিল; কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বন্ধ হইল—বেলা প্রায় আটটা। তারপর তাহারা বিধবাকে হাতের নোয়া ও এক আধটি অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা ছিল খোলাইল, সিঁদুর মুছাইয়া থান সাড়ী পরাইল—তখনকার যাহা যাহা কর্ত্তব্য, নিপুণ গৃহিণীর মত করাইতে লাগিল। বর্ষিয়সী-আত্মীয়া-মহিলারা থাকিলে সে কায যেমনটি হইত, আত্মীয়-স্বজন বিরহিত, সহানুভূতিশূন্য-প্রতিবেশি-পরিবৃত, এই অসহায়া রমণীর কুটিরে আজ ভগবানের কৃপায় সেই সব কায ঠিক্ তেমনটি করিয়াই হইয়া যাইতে লাগিল। কোথা হইতে, কোন্ অসম্ভব, অদৃষ্টপূর্ব্ব সূত্রে যে ঈশ্বরের সাহায্য এইরূপে আসিয়া পড়ে তাহা কোন রকমেই দূরদৃষ্টি, অভিজ্ঞতা বা বিচারবুদ্ধি, আমাদের বলিয়া দিতে পারে না। আজ ইহারা না থাকিলে মাতাপুত্রের যে কি দশা হইত তাহা ভাবিতেও ভয় করে।

কিছুক্ষণ পরে তাহাদের একজন কোথা হইতে ছেলেটির জন্য কিছু দুধ ও বিধবার হবিষ্যান্নের যোগাড় করিয়া ফিরিল। প্রথমে সে মায়ের হাতে দুধটুকু দিয়া বলিল "মা এইটুকু গরম করে' ছেলেটিকে একটু খাওয়াও, আহা বাছা হিমে একেবারে কালিয়ে গিয়েছিল—এইটি এখুনি খাইয়ে দাও।" এইরূপে ছেলেটির দিকে মনকে আকৃষ্ট করিয়া তাহারা এই শোক-সন্তপ্তা বিধবাকে যতটা সম্ভব অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

তাহারা নিজ-হাতে উঠানের খানিকটা খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিল। থান

ইট আনিয়া উনান তৈয়ারী করিয়া দিল। বারান্দার এককোণে কেরাসিন তেলের বোতল ও রান্নার চালায় 'ঘুঁটে-কাঠ' ছিল, আনিয়া উনানের পাশে জমা করিল। দুধ গরম করিবার যায়গা ছিল না, একজন চট্ করিয়া একটা কড়াই মাজিয়া দিল—আর একজন রমণীকে বলিল, "নাও মা, এবার ছেলেটিকে একটু দুধ গরম করে' দাও"—এই নিঃসম্পর্কীয়া সমাজ-পরিত্যক্তা পতিতাদের-ও যে এরূপ হৃদয় থাকিতে পারে, আমার কৈশোর-জীবনের অভিজ্ঞতায় সেরূপ কল্পনা আসিতেছিল না। যথাসময়ে ছেলেটিকে দুধ খাওয়ান হইল। তারপর তাহারা ধীরে ধীরে বিধবার নিকট হবিষ্যান্ন রাঁধিবার কথা পাড়িল। বিধবা এতক্ষণ অতিকষ্টে অশ্রুরোধ করিয়াছিলেন ও ক্রন্দনের অবকাশ পান নাই—এবার তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। যতবার নিজের এই দুর্দশার কথা মনে পড়ে, ততবারই তাঁহার অন্তঃকরণ রিক্ততার রুদ্ধ বেদনায় যেন ভাঙিয়া পড়িতে চায়। তিনি আবার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কিন্তু তাহারাও ছাড়িবার পাত্রী নয়। তাহারা যুক্তি দেখাইল, তর্ক করিল, শাস্ত্রে আছে—করিতে হয় বলিয়া ধর্ম্মের দোহাই দিল, অবশেষে হাতে পায়ে ধরিয়া অশ্রুসিক্ত কাতর নয়নে অনুনয় করিতে লাগিল। বলিল, "মা কিছু না কর, একমুঠো আলোচাল ফুটিয়ে গুণে দু'টি দানা মুখে দাও—দিতে হয়। আমাদের, কি আর-কারু, এ-টি করলে ত চল্‌বে না—তোমার মৃত-স্বামীর কল্যাণের জন্যে এটি করতে হয়—কর।" স্বর্গগত পতির কল্যাণ হইবে—এই বাক্য যেন মন্ত্রের মত

কার্য্য করিল ; বিধবা আর বেশী আপত্তি না করিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন।.........

যতক্ষণ না তাঁহার খাওয়া হইল ততক্ষণ তাহারা তাঁহার কাছে বসিয়া রহিল। বেলা যখন তিনটা, তখন তাহারা বলিল, "মা আমরা চট্ করে' স্নান করে' পেটে চারটি কিছু দিয়ে আসি। এই, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে-ই আস্‌ব "

সেই রমণী এতক্ষণে বলিলেন, "তোমরা কে বাছা জানিনা —কিন্তু যে-ই হও, যা' করলে তা' আপনার লোকেও করে না। তোমাদিকে ভগবান পাঠিয়েছেন—নইলে আমাদের এ বিদেশে বিভূঁয়ে কর্‌বার কেউ নাই। তোমাদের ঋণ এ-জন্মে শোধ দিতে পারবো না।"

উত্তরে তাহাদের মধ্যে যে বড় সে বলিল. "কিছু নয় মা—একে আবার 'করা' বলে ? আমরা কে জিজ্ঞাসা করছ ; মা—আমরা অতি অভাগিনী। জগতের যত পাপের অভিশাপ আমরা মাথায় ব'য়ে বেড়াচ্ছি। হায় মা, আমাদের কি সাধ্য যে তোমাদের পায়ের ধূলো নিতে-ও তোমাদের পা ছুঁই ! কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি ছিল তাই আজ তোমার এতটুকু কাজে লেগে-ও নিজেদের জীবনে একটুক্ষণের জন্যে পুণ্যের বাতাস পেলাম। দিনরাত আমাদের মনের মধ্যে নরকের যাতনা ; বিষাক্ত সাপে আমাদের বুকটা যেন রোজ ছুব্‌লে ছুব্‌লে খাচ্ছে ; সেখানে এতটুকু শান্তি নাই। সে যন্ত্রণা আজ এই এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলাম। মর্ত্ত্যেই আমরা নরক সৃষ্টি করে' তা'তেই জ্বলে' পুড়ে' মর্‌ছি ; আজ সেই জ্বালা তোমার

সংসারের পবিত্র বাতাস পেয়ে একটু কমে এসেছিল। এ শান্তির, এ সৌভাগ্যের যে দাম নাই মা! আজ তুমি আমাদের যা' দিলে তা' আমাদের স্বর্গ! আমরা তার তুলনায় কি করেছি মা? যদি আজ থেকে তোমাদের মত সতীলক্ষ্মীর এমনি পায়ের ধূলোতে রোজ পড়ে থাক্‌তে পেতাম্‌, তা' হ'লে আর সেই পাপের, দুর্দ্দশার পাঁকের মধ্যে ফিরে যেতে চাইতাম না। কিন্তু কে আমাদের সে প্রায়শ্চিত্তের সুবিধে দেবে? যার কাছে যাবো, যেখানে যাবো, সেখানেই সকলে সন্দেহ, কলঙ্ক আর লাঞ্ছনা দিয়ে কুকুরের মত 'দূর দূর' করে তাড়িয়ে দেবে!"·········তাহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, একটু সামলাইয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, "স্বামী যে কি রত্ন, তা জান্‌বার সৌভাগ্য আমাদের কখনো হয়নি, কিন্তু এখনো লোকের স্বামী-ছেলের সোণার সংসার দেখ্‌লে আমাদের-ও আগের কথা মনে পড়ে! মনে পড়ে আমাদের-ও এসব হ'ত, আমাদেরও এ স্বর্গসুখের ভাগ থেকে ভগবান বঞ্চিত করেন নি; কিন্তু পাপিষ্ঠা আমরা—জন্ম জন্ম দুষ্কৃতির এই বোঝা ত বইতে হ'বে; নইলে এমন মতিচ্ছন্নই বা হ'বে কেন? মা—যখনই নিজেদের পরিণতি আর পরিণামের কথা ভাবি তখনই এই বুক পরিতাপে, যন্ত্রণায়, আর বিষম ভয়ে যেন শতখানা হ'তে থাকে। আমাদের সমাজে স্থান নাই, আমাদের ফিরবার উপায় নাই, আমাদের কাঁদবার ঠাঁই নাই; আমাদের স্থান সেই—আমাদের তৈরী নরকে, আর যমের বাড়ীতে। পৃথিবীর পবিত্রতা আমাদের মুখ দেখ্‌লে আতঙ্কে

শিউরে ওঠে, পৃথিবীর আনন্দ আমাদের ত্রি-সীমানা ছেড়ে পালায়; বুঝি ভগবান-ও আমাদের কান্না সহ্য করতে পারেন না। বিশাল পৃথিবীর উজ্জ্বল আলোর রাজ্যে আমাদের কোথাও স্থান নাই— আমরা আলো, বাতাস, আশা, আনন্দ, সমস্ত থেকে লুকিয়ে, অন্ধকারে এককোণে পূতি-দুর্গন্ধের মধ্যে প্যাচার মত বেঁচে থাকি। কোন সুখের, কোন শান্তির অধিকার আমাদের নাই।—মাগো, গেরস্ত বাড়ীর কুকুর-বেড়ালটার-ও আমাদের তুলনায় যে স্বর্গসুখভোগের সুবিধা আছে, নিজেদের পাপে আমরা তা'র-ও অধিকার থেকে বঞ্চিত·········"

অশ্রুর প্রবল বন্যায় অভাগিনীর বক্তব্য ভাসিয়া গেল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! পাপীর পরিতাপের অশ্রু, যখন অসহনীয় রুদ্ধ বেদনার উৎস-মুখ মুক্ত করিয়া তাহার বুকের ভার লাঘব করিতে থাকে, তখন তাহার সেই অশ্রুপ্লাবিত, অনুতপ্ত, ধৌত-কলুষ, পবিত্রীভূত মূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মন তখন সমবেদনায় ও নীরব দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু সে দুঃখের মধ্যে অন্তর্নিহিত নির্ম্মল আনন্দের একটি অপূর্ব্ব ক্ষীণ ধারা, ফল্গুনীরের মত আত্মগোপন করিয়া সর্ব্বদা প্রবাহিতা হইতে থাকে; তাই পাপী অনুতাপীর ক্রন্দনে বাধা দিতে ইচ্ছা করে না, সে দিক হইতে নয়ন ফিরাইতে ও প্রবৃত্তি হয় না। এই অভাগিনীর ক্রন্দনে-ও তাই বাধা পড়িল না! চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস, যেন তাহার বুকের মধ্যে বেদনার জগদ্দল পাথরটিকে একটু আল্‌গা করিয়া দিল।

তারপর আর বেশী কথা হইল না—বিধবা রমণী যেন এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতেছিলেন। তাঁহার নিজের দুঃখ, এই অসীম ব্যথার হা-হা-কারে কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল! তিনি ইহাদিগকে মধুর বচনে বিদায় দিয়া, শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিলেন।

*** *** ***

আবার রাত্রি প্রভাত হইল! নীচে নীল জল, উপরে নীল আকাশ—চন্দ্র ডুবিতেছে, সূর্য্য ভাল করিয়া উঠে নাই; ম্লান আলো ও শীতের কন্‌কনে হু-হু হাওয়ায় একটি ষ্টীমার আপনার মনে গম্ভীর নীরবতায় দোল খাইতে ছিল। যাত্রীদের ব্যস্ততা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। স্থলের সহিত আপাততঃ সম্পর্ক চুকাইয়া প্রায় সকলেই ষ্টীমার ছাড়িবার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব। মাঝে মাঝে মাঝি-মাল্লাদের দুই একটা উচ্চকণ্ঠের চীৎকার, নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে—সকলেই নিজের নিজের শুইবার ও বসিবার স্থান করিয়া লইতে ব্যস্ত। তখনো ষ্টীমার-ঘাটের সিঁড়ি সরাইয়া দেওয়া হয় নাই, তিনটি রমণী তাহার উপর দাঁড়াইয়া তখনো কথা কহিতেছিল। তাহাদের কথা বুঝি আর শেষ হইবার নহে।

ইহাদের মধ্যে সেই বিধবা রমণী ছেলে কোলে করিয়া অশ্রুছলছল চক্ষে অভাগিনীদ্বয়ের নিকট বিদায় লইতেছিলেন, আর তাহারা ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিতেছিল।.........

দুলালী

ষ্টীমারের ভোঁ দিল। খালাসীরা সিঁড়ি সরাইবার জন্য অগ্রসর হইল। বিধবা, পুত্রটিকে কোলে লইয়া ত্রস্তভাবে যাইবার জন্য মুখ ফিরাইলেন। সেই রমণীরা ছেলেটির হাতে গুটিকয় খেলনা দিল; তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম খাইল। তারপর মাতাপুত্রের পানে শেষ অশ্রুসজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ভাঙা গলায় কি বলিয়া শেষবারের মত বিদায় লইয়া তীরে উঠিল। ষ্টীমার ধীরে ধীরে যমুনাবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল।

——o——
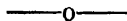
অবসান

আমার পিতা সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। তখনকার এফ-এ পাশ—মাইনে ছিল কম, আর এ ক্ষেত্রে, যা' থাকে না, তাঁর সেটি ছিল ; অর্থাৎ সংসারটি ছিল ছোট।

দেশের অল্প কয় বিঘা জমী সমস্ত বেচিয়া ও ভদ্রাসনটি বন্ধক রাখিয়া যখন তিনি কোনও মতে আমার ভগিনীর বিবাহ দিয়া ফেলিলেন তাঁহার পোষ্য রহিলাম কেবল আমি ও আমার মা। তাঁহার চাকরীর টাকাই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন হইল। কিছুই জমিত না ; যাহা আসিত, তাহাতে কোন রকমে সংসার-খরচ চলিয়া যাইত। ভিটাটুকু রক্ষা করিবার আর কিছু উপায় হইল না। এমন সময় এক দিন তিনি দারিদ্র্যের ও দুশ্চিন্তার হাত এড়াইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

আমি সেইবার গ্রামের স্কুল হইতে 'ম্যাট্রিকুলেশন' পরীক্ষা দিয়াছি—তখনও ফল বাহির হয় নাই। ইচ্ছা ছিল, এইবার একটা চাকরী করিয়া মায়ের দুঃখ মোচন করিব। কপালে থাকিলে পরে লেখাপড়া হইবে।

আমার 'জ্যেঠা, খুড়া' কেহ ছিলেন না। এক দিন আমার হাত ধরিয়া মা বলিলেন, "চল্ বাবা, তোর মামার বাড়ী যাই !"—জ্ঞান হওয়া অবধি মামার বাড়ী দেখি নাই, আর নিজেদের সেই জনহীন, হতশ্রী

বাড়ীটাও যেন একটা আতঙ্কের জিনিষ হইয়াছিল, তাই মামার বাড়ী যাওয়ার চিন্তায় বরং আনন্দই হইল।

এমন সময় আমার পিতার এক বন্ধুর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। তিনি লিখিতেছেন :—

"·········বাবা বিমল, তোমার পিতা আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। আমি তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বড়ই কাতর হইয়াছি। তাঁর কাছে আমি অশেষ প্রকারে ঋণী ; তিনি এক সময় আমার বড় উপকার করিয়াছিলেন। সে জন্য না হইলেও, তুমি আমার প্রিয়তম বন্ধুর পুত্র, এই হিসাবেও তোমার উপর আমার দাবী আছে। তুমি আমাদের পর নও। পরীক্ষার খবর বাহির হইলেই তুমি আমার নিকট চলিয়া আসিবে। তোমার পড়ার যে সামান্য খরচ হইবে, তাহা আমিই দিব। কোন দ্বিধা করিও না—আমায় তোমার পিতার সহোদর মনে করিবে। ········"

আমি মাঝে মাঝে বাবার কাছে তাঁহার এই পাটনার উকীল বন্ধুটির কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি এক সময় ইঁহার উপকার করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতাম। কিন্তু মা এই নিঃস্পর্ক ভদ্রলোকের দান গ্রহণ করিতে চাহিলেন না।

আমি তখন তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদসহ জানাইলাম যে, আপাততঃ মা ও আমি আমার মাতুলালয়ে যাইতেছি ; সেখানে আমার মামাই আমার সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন।

***   ***   ***

সাত ক্রোশ রাস্তার ধূলা মাখিয়া আমাদের গরুর গাড়ী যখন ক্যাঁচ-কোঁচ করিতে করিতে মামার 'মাট-কোঠা' ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন—"কে এসেছে গো" বলিয়া মামীমা মায়ের হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। 'কি রে অণি এলি ?' বলিয়া মামা বাহিরে আসিলেন। মা উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া মামা বলিলেন—"যাক্ ও সব কথা ; আয়, উঠে আয়। এক মায়ের পেটে যখন ঠাঁই হয়েছে, তখন এক ঘরেও খুব হবে।" এইরূপে আমরা মাতুলালয়ে স্থানলাভ করিলাম।

আমার পরীক্ষার খবর বাহির হইল। কয়েক দিন পরে একদা সন্ধ্যাবেলায় মামা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিমল, তুই দশ টাকা জলপানি পেয়েছিস্। কি কর্‌বি ইচ্ছে আছে ?"

আমি বলিলাম, "আমার ত ইচ্ছে যে, কোনও রকম ছোটখাট চাকরী করি !"

"কেন, তোর কি আর পড়্‌তে ভাল লাগে না না কি ?"

আমি উত্তর দিলাম, "না, পড়্‌তে ত খুবই ইচ্ছে যায়। কিন্তু মা রয়েছেন, চাকরী করলে যদি তাঁকে কিছু সুখে রাখতে পারি।"

তিনি হাসিতে লাগিলেন—"কেন রে, আমার কাছে তোর মা বুঝি বড় কষ্ট পাচ্ছে, না ?"

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, "না, তা কি আমি বল্‌ছি? তবে আমার ত তাঁকে পালন করা কর্ত্তব্য।"

তিনি বলিলেন, "তার ঢের সময় আছে এখন। তোকে এর মধ্যে সে জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না। এখন 'স্কলারশিপ'টা ছাড়িস্ না; আমার সঙ্গে চল্, ভাগলপুরেই পড়বি আর আমার কাছে থাক্‌বি। তোর মাকে বলিস, বুঝলি?"

মামার সন্তানাদি কিছুই ছিল না। তিনি ভাগলপুরে কায করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গেই সেখানে আসিলাম। কলেজে ভর্ত্তি হইয়া দেখি, সরোজও সেখানে পড়িতে আসিয়াছে। সরোজের পিতা আমাদের গ্রামের মধ্যে বেশ বড়লোক। ভাগলপুরে গালার ব্যবসা করিয়া তিনি লক্ষপতি হইয়া সপরিবারে গ্রামেই বসবাস করিতেছিলেন। সরোজ আমার সঙ্গেই গ্রামের স্কুল হইতে 'ম্যাট্রিকুলেশন' দিয়াছিল। তাহার পিতার ভাগলপুরের বাড়ী এত দিন মালীর জিম্মায় ছিল। পুত্র উপযুক্ত হইলে তাহাকে লইয়া ভাগলপুরে থাকিবেন ও কলেজে পড়াইবেন, এই উদ্দেশ্যেই সেই বাড়ী তিনি বিক্রয় করেন নাই। ছোটবেলা হইতেই সরোজ পিতার বড় প্রিয়পাত্র ছিল ও সংসারে তাহার অন্য কোন অভিভাবক না থাকায় সে সুবিধা পাইয়া একটু বেশী রকম বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ছাড়া তাহার অন্য কোন দোষ ছিল না। আমরা দুই জনে একসঙ্গে স্কুলে পড়িয়াছিলাম, আবার একসঙ্গে কলেজেও পড়িতে পাইব বলিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমাদের পূর্ব্ব-সৌহার্দ্দ্য আরও গভীর হইয়া চলিল।

অবসান

ভাগলপুরে মামা একটি ছোট বাসা করিয়া ছিলেন; এক জন-ঠাকুর ও চাকরও ছিল। মামা দিনের অধিকাংশ সময় অফিসে ও বাকীটুকু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজবে কাটাইতেন। আমিও কলেজের পর অধিকাংশ সময়ই সরোজের বাড়ীতে কাটাইতাম। সে বেশ গান গাহিতে পারিত। তাহাদের অর্গানের সহিত নিজের মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া সে যখন গৃহটি স্বরের মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া দিত, তখন আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। কোন দিন বা আমরা দুই জনে কলেজের পর গঙ্গার ধারে বেড়াইতাম— কত গল্প হইত। কোন কোন দিন যখন সন্ধ্যার রঙীণ মায়া গঙ্গার বুকে স্বর্ণ-সম্পদে নামিয়া আসিত, তখন তাহার আকুল কণ্ঠে ধ্বনিত হইত :—

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর.........'! কতই আনন্দে আমাদের সে দিনগুলি চলিয়া গিয়াছে! আজ সে কথা যখন মনে পড়ে, মনে হয় যেন একটি অখণ্ড সুখ-স্বপ্নেরই মত একটানা আনন্দে গত হইয়াছে! সে সুখের তুলনা ছিল না। আমরা দুই জনে পরস্পরের অতি নিকটে আসিয়াছিলাম ও উভয়েই মনে করিতাম, আমাদের মত বন্ধু বুঝি বিশ্বে সুদুর্ল্লভ! আমাদের এ প্রীতির নিকট যে কোন সাধারণ নিয়ম খাটিবে না, এই অসাধারণ ধারণাতেই আমাদের হৃদয় পূর্ণ ছিল।

ভাগলপুরে আসিয়া আমার সেই পিতৃ-বন্ধু পাটনার ভবেশ বাবুকে জানাইলাম যে, আমি বৃত্তি পাইয়া সেখানে পড়িতেছি, মামার নিকট আছি। তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া আমাকে অনেক স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ-পূর্ণ একখানি পত্র দিলেন। তাহার পর তিনি আমায় প্রায়ই

চিঠি লিখিতেন। প্রায় প্রত্যেক ছুটীর প্রথমেই তিনি আমায় লিখিতেন—'বাবা বিমল, তোমায় খুব ছেলেবেলায় দেখেছি; এখন তুমি বড় হয়ে লেখাপড়া কর্‌ছ, তোমায় একবার দেখতে বড় ইচ্ছে করে। তুমি এই ছুটীর প্রথম ক'টি দিন এখানে এসে কাটাও।'.........

যখন আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা দিলাম, তখন মামা ভবেশ বাবুর এক পত্র পাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "বিমলের পিতা আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর দ্বারা আমি এক সময় বড় উপকৃত হই। বিমল আমাদের পর নয়। অনুগ্রহ ক'রে তা'কে দিন-কতকের জন্যে এবারে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

মায়ের কাছে যখন গ্রামে গেলাম, তখন তিনি অনুমতি দিয়া বলিলেন, "ভদ্রলোক যখন এত ক'রে লিখেছেন, না হয় দিন-কতক পাটনা গিয়ে বেড়িয়ে আয়। পড়ার মাঝে মাঝে একটু একটু বেড়ানো ভাল।"

নূতনত্বে আমার চিরকালই আনন্দ। চিঠি দিয়া পাটনা রওণা হইলাম। ষ্টেশনে নামিয়া দেখি, একজন গৌরবর্ণ প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ষ্টেশনের নিকটেই তাঁহার সাদা একতলা বাড়ীখানি। লাল নীচু প্রাচীরে ঘেরা। উঠানে দুই একটি কলম-করা আম ও লিচুর গাছে মুকুল ভরা। বাড়ীখানি নূতন তৈয়ারী ও একটি ছোট পরিবারের সুখে-

স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে বেশ উপযুক্ত। বিশেষত্বের মধ্যে, প্রশংসনীয়-পরিচ্ছন্নতায় চতুর্দ্দিক্ মনোরম।

তিনি আমায় সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন ও তাঁহার স্ত্রীর নিকট আমায় বসাইয়া আমার জিনিষপত্রগুলি দেখিতে বাহিরে আসিলেন। এই ভদ্রপরিবার এত অল্প সময়ের মধ্যে আমায় নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন যে, আমি তাঁহাদের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

ভবেশ বাবুর স্ত্রী আমায় নিজের পুত্রের মত যত্ন করিতেন। তাঁহার নয় বছরের ছেলে অনিলের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হইয়া গেল। সে আমায় 'দাদা' 'দাদা' বলিয়া সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে ঘুরিত। আমি ইহার পূর্ব্বে কখনও পাটনায় আসি নাই। সে-ই আমায় নানা যায়গা দেখাইয়া আনিতে লাগিল; সকালে ও বিকালে সে-ই আমার বেড়ান'র সাথী হইয়া উঠিল।

যতক্ষণ ঘরে থাকিতাম, অনিল বড় একটা আমার কাছে আসিত না; ঘুড়ি, লাট্টু বা ঐরূপ একটা কিছু লইয়া সেই সময়টা সম্মুখের রাস্তায় কাটাইতেই সে বেশী আমোদ পাইত।

ভবেশ বাবু যে খুব বেশী টাকা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা মনে হইল না। বাড়ীটি করিয়া ও দুইটি মেয়ের বিবাহ দিয়াই বোধ হয় সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার একটি মেয়ে অবিবাহিত।

লীলাকে আমি দেখিয়াছিল—যে বাস্তবিকই সুন্দরী। ঘরের ছোট-

বড় প্রায় সমস্ত কাযই, আমি দেখিতাম, সে হাসিমুখে করিতেছে। আমাকেও সে স্নানের সময় তেল, গামছা ইত্যাদি আনিয়া দিত। সেই সময় আমার দৃষ্টিতে সে বড় সুন্দর ঠেকিত। তাহার সেই ছোট ছোট কাযগুলি আমার বড় ভাল লাগিত। এখন বুড়া হইয়াছি, বলিতে লজ্জা নাই—তখনকার সেই কিশোর-বয়সের প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহাকে অশেষ সুষমা-মাধুরীময়ী বলিয়া মনে হইত। অল্পে অল্পে সে আমার তরুণ-হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিতেছিল। যদি ইহাকে ভালবাসা বলা যায়, তাহাকে ভালবাসিলাম।

কি জানি কেন আমার মনে হইত, ভবেশ বাবু আমাকে যে এত স্নেহ করেন, বাড়ীর মধ্যে বাড়ীর এক জনেরই মত করিয়া রাখিতে চাহেন, লীলাকে অবাধে আমার ছোটখাট কাযগুলি করিতে দেন, ইহার নিশ্চয় কোন অর্থ আছে। আমার সন্দেহ হইল, হয় ত তিনি আমার সহিত লীলার বিবাহ দিতে চাহেন। যাক্, সে সময় আমি মনের কথা মনেই রাখিলাম।

কিছু দিন থাকিয়া যখন আবার মায়ের নিকট ফিরিয়া গেলাম, তিনি আমায় অনেক প্রশ্ন করিলেন, "কেমন লোক, কি রকম যত্ন করলে"—ইত্যাদি।

আমি মাকে বুঝাইয়া দিলাম—চমৎকার লোক, অমন সুন্দর মানুষ আমি আর দেখি নাই। লীলার কথা অবশ্য গোপন রাখিলাম।

—২—

দিন কাটিয়া যায়, মানুষকে সে জন্য চিন্তা করিতে হয় না। আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল, আমি সেইবার আই-এ পরীক্ষা দিলাম।

সরোজ আমায় কিছুদিন ভাগলপুরে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। আমিও রহিয়া গেলাম। দিনকতক গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরিয়া যখন আমরা দুই জনেই বেশ বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই সময় এক দিন সরোজ বলিল, "চল না হে একবার পাটনায় গিয়ে তোমার মানসীকে দর্শন ক'রে আসা যাক্।" বলাবাহুল্য, আমার একমাত্র সহচর ও প্রিয় বন্ধু সরোজকে আমি লীলার কথা সমস্তই বলিয়াছিলাম।

মামার অনুমতি পাইতে দেরী হইল না। ভবেশ বাবু আমায় নিয়মিতভাবে মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিতেন। তিনি আগেই আমায় তাঁহার কাছে যাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জানাইলাম, আমার এক বন্ধুর সহিত আমি পাটনা যাইতেছি।

প্রথমবারের মত এবারও দেখিলাম, তিনি নিজেই আমাদিগকে লইতে আসিয়াছেন। দুই এক দিনের মধ্যে সরোজও আমারই মত পরিবারস্থ

এক জন হইয়া পড়িল। পরকে ইঁহারা বড় শীঘ্র আপনার করিয়া লইতে পারিতেন।

লীলাকে প্রথম দেখিয়া সরোজ আমায় চুপি-চুপি বলিল, "সত্যিই ত ভারী সুন্দর!" বলার ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগিল না। তবু ঠাট্টা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম, "বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়?"

সে যেন একটু অনুৎসাহের সুরেই উত্তর দিল, "তার আগে ত তোমার সঙ্গে 'ডুয়েল' লড়তে হবে?"·········যাক্, কিছুদিন বেশ আনন্দে কাটাইয়া আমরা ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিলাম।

সরোজ ও আমি দুই জনেই প্রথম বিভাগে পাশ হইলাম। আমি অধিকন্তু একটা ২০ টাকার বৃত্তি পাইলাম। মামা বলিলেন, "বি-এ,-টাও প'ড়ে নে, এত সুবিধে ছাড়িস্ না।" আমিও মায়ের আদেশ পাইয়া বি-এ পড়িতে লাগিলাম। এই সময় আমার সহিত সরোজের ছাড়াছাড়ি হইল। হঠাৎ তাহার খেয়াল চাপিল, সে পাটনায় পড়িবে। আমার কেমন যেন তাহার উপর একটু রাগ হইল। কিন্তু তবুও সে পাটনায় পড়িতে গেল।

*** *** ***

অবসান

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা দিয়া আমি একবার পাটনায় ভবেশ বাবুর নিকট গেলাম। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমায় পূর্ব্বেরই মত যত্ন করিলেন। কিন্তু সেবার লীলার দর্শন তত সুলভ হইল না। ভাবিলাম, বয়স হইয়াছে বলিয়া হয় ত আর তাহাকে পূর্ব্বের মত সব সময় সকলের সাম্নে বাহির হইতে দেওয়া হয় না।—কিন্তু আমিও কি এত বাহিরের লোক—যাহা হউক্, এ চিন্তা আর ভাল লাগিল না।

একদিন সরোজ আমায় দেখিতে আসিল। সে আসিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ গল্প-সল্প করিল। শেষে বলিল, "এবার ত উঠতে হবে, একবার বাড়ীর ভেতরটা ঘুরে আসি। আমিও প্রায় সপ্তাহখানেক এখানে আসি নাই।" সে বাড়ীর মধ্যে খাইতে গেল। আমি দেখিলাম, সে খাবার খাইতে বসিয়াছে ; লীলাকে লইয়া তাহার মা সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতেছেন। আমি ভাবিলাম—লীলাকে ত কোন দিন আমার কাছে তাহার মায়ের সঙ্গেও বসিয়া থাকিতে দেখি নাই! তাহার পর মনে হইল, আমি ত অনেক দিন পরে একবার আসিলাম, সরোজ কতবার আসে ; তাহার সহিত ত ঘনিষ্ঠতা হইবারই কথা! কিন্তু তবু যেন মন প্রবোধ মানিল না। যাহা হউক্, যে চিন্তায় অশান্তি আনে, তাহা পরিত্যাগ করাই ভাল, এই বিবেচনায় সে বিষয়ে আর মন দিলাম না।

***　　***　　***

তাহার পর আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল; আমি বি-এ দিয়া আবার পাটনায় আসিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম যদি আমার সহিত লীলার বিবাহ দেওয়াই ভবেশ বাবু ঠিক করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এবার তিনি নিশ্চয়ই সে কথা পাড়িবেন।

এক দিন সরোজকে নিমন্ত্রণ করা হইল। আমরা দুই জনে খাওয়া-দাওয়া করিলাম। সমস্ত দুপুর গল্প করিবার পর লীলার মা বলিলেন, "সরোজ, একটু গান-টান কর না, বাবা?"

আমিও শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সরোজ সম্মত হইল। সে দুই একটা গান গাহিবার পর লীলার মাতা লীলাকে ডাকিলেন। সলজ্জ কিশোরী ধীরে ধীরে মায়ের পাশে দাঁড়াইল। এই কয় বৎসরে লীলার সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়াছে। তাহার মা তাহাকে বলিলেন, "সরোজ-দা'র কাছে যে গান শিখেছ, তার দু' একটা বিমলকে শুনিয়ে দাও ত, মা।"

নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে লীলা অর্গানের পাশে দাঁড়াইল। সরোজ বাজাইতে লাগিল, সে ধীরে ধীরে আরম্ভ করিয়া অতি সুন্দরভাবে একটি গান শেষ করিল। তখন সরোজ নিজের কণ্ঠ লীলার সহিত মিলাইয়া আর একটি গান গাহিল। এবার সঙ্কোচ দূর করিয়া লীলা যেন একটু সহজভাব ধারণ করিল। আরও দুই একটি গানের পর তখনকার মত সভা-ভঙ্গ হইল। সন্ধ্যার সময় সরোজ যখন বিদায় লইতেছে, তখন লীলার মা তাহাকে বলিলেন, "তুমি এখন আর গান না শেখাও,

বিমলের সঙ্গে গল্পও ত করবে, রোজ যেমন আস্‌তে, তেম্‌নি এসো, বুঝ্‌লে বাবা ?”

হ্যাঁ, আস্‌বো বই কি’—বলিয়া সরোজ চলিয়া গেল।

তখন আমি ধীরে ধীরে ব্যাপারটা উপলব্ধি করিলাম। সরোজ বড়লোকের ছেলে, সে যে আমার অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় পাত্র, তখন আমার সে কথা মনে হইল। সে লীলাকে নিয়মিত গান শেখায়। আমার কি দাবী আছে ইহাদের উপর ? আর সরোজের মত বড়লোক জামাতা পাইলে, কেন ইহারা আমার মত নির্ধন গরীবকে জামাই করিবে ? তবু এ সন্দেহের শেষ করিবার জন্য সঙ্কল্প স্থির করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পরে ভবেশ বাবুর বৈঠকখানায় গেলাম।

ভবেশ বাবু একলাই বসিয়াছিলেন। কি বলিয়া কথা পাড়িব স্থির করিতে না পারায় চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। তিনি বলিলেন, “কি বাবা, কেমন লাগছে এখানে ?”

আমি বলিলাম, “বেশ আনন্দেই সময় কাট্‌ছে ত।”

তখন দুই একটি কথায় সরোজের কথা আসিয়া পড়ায় তিনি বলিলেন, “হ্যাঁ, ছেলেটি বেশ।” বড়লোকের ছেলে, তার ওপর লেখা-পড়াও শিখেছে। আমি ত মনে করছি, তার সঙ্গে লীলার বিয়ে দেবো। তোমার কি মনে হয়, মন্দ হবে না, কি বল ?”

আমি আর কি বলিব—তখন বুঝিলাম, আমার সন্দেহই ঠিক। টাকাকড়ি-চালচুলাহীন আমার মত গরীব কি সাহসে লীলার স্বামী

হইবার ভরসা করে?—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ত বেশ-ই হবে" বলিয়া আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর উঠিয়া পড়িলাম। সমস্ত আনন্দ যেন একসঙ্গে যুক্তি করিয়া আমার কাছ হইতে পলাইল। আমি এক রকম টলিতে টলিতে শয়নকক্ষের দিকে চলিলাম—আলো, দেয়াল, ফুলের টব যেন আমার চারিধারে নাচিতে লাগিল। বাতি নিভাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। শেষে ইহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলাম? ইঁহারা আমার কে? আমি ত ইঁহাদের চিনিতাম না। আমায় অত করিয়া না টানিলে আমিও ত আসিতাম না। যদি কাঙালকে রত্নের লোভ দেখাইলে—তবে কেন তাহা দিলে না? এই কি পিতার উপকারের প্রত্যুপকার? আর ভাবিতে পারিলাম না। ভোরের মৃদু-বাতাস আমার তপ্ত ললাটে তাহার শীতল স্পর্শ বুলাইয়া গেল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে উঠিয়া শুনিলাম, আমার নামে একটি 'টেলিগ্রাম' আছে। তাহাতে এইটুকুমাত্র লেখা ছিল;—

"তোমার মামার অসুখ, শীঘ্র চলিয়া আসিবে।"

আমার চেহারা দেখিয়া ভবেশ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "বাবা, তোমার কি রাত্রে অসুখ করেছিল?"

ভবেশ বাবুও বলিলেন, "তাই ত, কালকের চেয়ে তোমার যে, মুখখানা শুক্‌নো ঠেক্‌ছে।"

আমি বলিলাম, "কই না, অসুখ ত করেনি; তবে কাল ঘুমুতে

একটু রাত হয়েছিল ব'লে যদি শুক্‌নো দেখায়। সে যাক্, আমাকে ত আজই যেতে হবে—এই দুপুরের ট্রেণে ; একখানা গাড়ী বলে' রাখলে হয়।"

ভবেশ বাবু আমায় আর বাধা দিলেন না। আমিও শূন্য হৃদয় লইয়া অনিশ্চিত বিপদের দিকে অগ্রসর হইলাম।

গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে। মামার হৃদ্‌রোগ ছিল ; তিনি আমার আসিবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় মারা গিয়াছেন। মা মামীমা'র ক্রন্দন শুনিয়া আমিও স্থির থাকিতে পারিলাম না। এতদিনে আমরা একমাত্র অভিভাবককে হারাইলাম।

তখন আর অন্য উপায় রহিল না। এই দুই জন স্ত্রীলোক ও নিজের জন্য চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বহু কষ্টে মজঃফরপুর হাই-স্কুলে একটি মাষ্টারী যুটিল। বেতন চল্লিশ—দুইটি ছেলে পড়াইতাম। সহরেই মা ও মামীমাকে আনিয়া আমার ছোট সংসার পাতিলাম। এই অল্প বেতনে কায করিয়াও, মা ও মামীমার ম্লান-মুখে আনন্দের আভাস দেখিয়া আমি নিজেকে সার্থক মনে করিতাম। এই ভাবে একটানা রকমে আমার বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কাটিয়া চলিল।

সংসারের যোয়াল ঘাড়ে লইয়া আর সরোজের সহিত পূর্ব্ব-ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করা সম্ভব হইল না। কদাচিৎ এক-আধটা পত্র-বিনিময় চলিত।

—৩—

মজঃফরপুরে আসিয়া কর্ত্তব্যবোধে একবার ভবেশ বাবুকে মামার মৃত্যুসংবাদ দিয়াছিলাম, তিনিও তাহার উত্তর দিয়াছিলেন; তাহার পর তিন মাস আর কোন পত্র-ব্যবহার হয় নাই।

হঠাৎ একদিন অন্যান্য পত্রের সহিত পাটনার ছাপসংযুক্ত একখানি লাল খাম আসিল। ত্রস্তভাবে সেখানি খুলিয়া দেখিলাম, উহা লীলার বিবাহে আমার নিমন্ত্রণ-পত্র। সরোজের সহিতই বিবাহ হইতেছে। মাকে আমি কিছুই বলি নাই, তিনিও কিছুই জানিতেন না—তিনি আমায় পাটনা যাইবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আহা, তোকে তাঁরা কত ভালবাসেন, তাঁদের মেয়ের বিয়েতে একটু আমোদ-আহ্লাদ ক'রে আসা তোর উচিত; তার ওপর তোরই বন্ধুর সঙ্গে যখন বিয়ে!"

কিন্তু আমি জানিতাম, কেন আমার যাওয়া উচিত নয়। আমোদ-আহ্লাদও কতখানি হইবে, তাহাও বেশ বুঝিয়াছিলাম। তবু একবার যাইব ভাবিলাম। ৫।৬ দিন পূর্ব্বেই যাত্রা করিলাম।

ভবেশ বাবু বোধ হয় আমার আগমন প্রত্যাশা করেন নাই। কেন না, তিনি যেন বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছেন, এইভাব দেখাইলেন ও কি যেন অজানা কারণে লজ্জিত, এই ভাবে আমার সহিত বেশী-ক্ষণ কথাবার্ত্তাও কহিতে পারিলেন না। যাহা হউক্, আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা যথেষ্টই হইল।

অবসান

বিবাহের তখনও পাঁচ দিন দেরী আছে। আমি সেই দিন সন্ধ্যার সময় সরোজের বাসায় তাহার খোঁজ লইতে গিয়া শুনিলাম—"ছোটা বাবু টহলনে গিয়া।"

দারোয়ান রাম সিং বুড়া লোক। সরোজের পিতামহের আমলের চাকর। সে ভাগলপুরেও সরোজের কাছে থাকিত। আমি তখন তাহাদের বাড়ীতেই বেশীর ভাগ সময় থাকিতাম ও সরোজের যে খুবই নিকট-বন্ধু ছিলাম, তাহাও এই বৃদ্ধ জানিত; সে আমাকে সরোজেরই মত খাতির করিত। আজও বুড়া রাম সিং এই বাড়ীতে 'ছোটা বাবুর' সঙ্গে আসিয়াছে। আমি আর কাহাকেও পরিচিত না পাইয়া ও সরোজের সহিত একটু অপেক্ষা করিয়া দেখা করিব ঠিক করিয়া দরোয়ানজীর খাটিয়ার এক পাশে বসিয়া পড়িলাম। রাম সিং ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বাবু, ইস্‌পর্ কাহে, কুর্‌শী লে আন দেঙ্গে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কেন রাম সিং, আমি কি এতটাই বাবু বনে গেছি দেখ্‌ছ? ভাগলপুরে যে এই খাটে শুয়েই কত দুপুর তোমার দেশের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনে নাই?"

রাম সিং বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "আ—বাবু, উসব দিন চলা গিয়া। আপ ত বৈসাহি রহ্‌ গিয়া, লেকিন হামারা ছোটা বাবু"—বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল। তাহার প্রভাহীন চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।—"বড়ি আফশোষ কী বাৎ বাবু!" বলিয়া সে কথাটা শেষ করিল!

আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে সরোজেরই বা কি এমন পরিবর্ত্তন হইল, যাহাতে এই প্রভুভক্ত বৃদ্ধ এমন বিচলিত হইয়াছে! আমি কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। তবে কি এ তাহার বিলাসিতার-ই কথা? আমি সহানুভূতির সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে রাম সিং তোমার ছোট বাবুর? তাঁর ত আর পাঁচ দিন পরে সাদি হবে—এর মধ্যে দুঃখের কথা কি আছে? তুমি আমায় সমস্ত খুলে বল। পর ব'লে সঙ্কোচ কোরো না; জান ত, আমা হ'তে তোমার বাবুর উপকার ছাড়া কখনো অপকার হবে না?" সে তখন ভাঙা ভাঙা বাঙ্লায় চোখের জল মিশাইয়া যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই :—

গত দুই মাস হইতে সরোজের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে এখন মদ ধরিয়াছে। একজনের বাড়ীতে কিছুদিন হইতে সে কাহাকে গান শিখাইতেছে। এই ঘটনার পর হইতেই সরোজ বেশী করিয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃদ্ধ দ্বারবান্ সরোজকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরায় সে বলিয়াছিল যে, সে টাকার জন্য গান শিখাইতেছে না—সে মাহিনা লয় না। প্রভুভক্ত দ্বারবান্ সরোজকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সে শুধু কঠোর-স্বরে বলিয়াছিল যে, বৃদ্ধ যেন উপদেশ দিতে না আইসে! সে যে দ্বারবান্, তাহা যেন ভুলিয়া না যায়!

প্রসঙ্গশেষে বৃদ্ধ বলিল, "বাবু, যাকে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ

কর্লাম, তার এই কথা! কিন্তু বুড়ো মানুষ আমি কি কর্তে পারি? বড় বাবুকে জানালে যদি ছোট বাবুর কিছু মন্দ হয়—তাই চুপ ক'রে আছি। আপনি ছোট বাবুর বন্ধু, আপনি যদি তাঁকে দয়া ক'রে ও পথ থেকে ফিরিয়ে আনেন, তাই আপনাকে সমস্ত বল্লাম।"

বৃদ্ধ চুপ করিল।

আমি তখন রাম সিংকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম, "আমার যথাসাধ্য চেষ্টা কর্বো, তুমি ভেবো না।"

"ভগবান্ আপকা ভালা করে"—বলিয়া বৃদ্ধ সজল নয়নে কৃতজ্ঞতাভরে আমার দিকে তাকাইল।

সে দিন একটু রাত হইয়া যাওয়ায় আর সরোজের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভবেশ বাবুর বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার ঘুম হইল না। তখন আমি এক মহাসমস্যার সমাধানে ব্যস্ত।

লীলাকে আমি ভালবাসি। আমার সহিত তাহার বিবাহ না হইয়া সরোজের সহিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। লীলা যদি সুরাসক্ত সরোজের হাতে পড়ে, তবে তাহার সুখ-শান্তি যে জন্মের মত শেষ হইবে, বুঝিলাম। ভালবাসার পাত্রকে যাবজ্জীবন কষ্টের মুখে তুলিয়া দিতে কাহারও প্রাণ চাহে না। কিন্তু উপায় কি?

প্রথমতঃ সরোজ যদি নিজেকে আমূল সংশোধন করে, তাহা হইলে লীলা সুখী হইলেও হইতে পারে। আর এক উপায় আছে, সরোজের প্রকৃত চরিত্র যদি ভবেশ বাবুর নিকট প্রকাশ করি, তাহা হইলেও তিনি

লীলাকে বাঁচাইতে পারেন এবং—এবং লীলা আমার হইতে পারে! আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। এ উপায়ই ত বেশ!

কিন্তু একটু পরেই আমার লোভের আবেগ কাটিয়া গেলে, আমি এই দুর্ব্বলতা জয় করিলাম। ভাবিলাম, আমি যদি লীলাকে ভালই বাসিয়া থাকি, তবে তাহার যাহাতে সুখ হয়, তাহাই করিব। তাহার পক্ষে সরোজও যে, আমিও সে; সে গৃহস্থের মেয়ে, আমাদের ভালবাসিয়া ফেলে নাই নিশ্চয়। বরং সরোজ তাহাকে এত দিন গান শিখাইয়াছে, তাহার সহিত মিশিয়াছে, তাহার উপরেই লীলার আকর্ষণ হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষতঃ সরোজের হাতে পড়িলে সে কখনও অর্থকষ্ট ভোগ করিবে না; বরং আমার মত নির্ধনের গৃহে তাহাকে লইয়া গেলে, তাহার হয় ত অনেক সাধ মিটিবে না। আর, সরোজ আমার বন্ধু; সে যদি লীলাকে পাইলেই সুখী হয়, কেন তাহাতে বাদ সাধিব?

সে যাহা হউক্, আমি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। ভাবিলাম, প্রথমে খোঁজ লইব, সরোজ কেন মদ খায়; তাহার পর যে উপায়ে পারি, তাহার ঐ বদ্ অভ্যাস ছাড়াইব। ইহার জন্য 'তাহার পিতাকে জানাইব ও ভবেশ বাবুকে বলিয়া এই বিবাহ বন্ধ করিয়া দিব'—এমন ভয় দেখানও প্রয়োজন বুঝিলে করিতে হইবে স্থির করিলাম।

পরদিন সকালে গিয়া সরোজকে বাহিরের ঘরেই পাইলাম। তাহাকে বলিলাম, "ভাই, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, চল, একটু বাগানের মধ্যে বেড়াই গে।"

একটুক্ষণ বেড়াইবার পর আমি হঠাৎ সরোজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কেন মদ ধরিয়াছে। যেন এ প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিল, এই ভাবেই উত্তর করিল, "কেন যে মদ ধরেছি, শুনবে—তোমারই জন্যে।"

আমি ত অবাক্। আমারই জন্যে? কিছুক্ষণ পরে তাহাকে বলিলাম, "তোমার কথা বুঝতে পার্‌ছি না—খুলে বল।"

"এ সামান্য কথাটা আর বুঝতে পার্‌লে না?"—

তখন সে গম্ভীর হইয়া বলিল, "সত্যি বল্‌ছি ভাই, লীলাকে আমিও ভালবেসেছি। যখন মনের মধ্যে সে খবর পৌঁছল, তখন দেখলাম, বন্ধুর প্রতি একটা মস্ত অন্যায় কর্‌তে বসেছি। কিন্তু তবুও অনেক চেষ্টা করেও তাকে ভুলতে পার্‌লাম না। বরং এই বিরোধের ফলে লীলার সঙ্গ আরও বেশী দরকার হয়ে পড়ল। তখন মদ ধর্‌লাম।

"কেন, জান?—কখনও আমার অবস্থায় পড়লে জান্‌তে। বেশ বুঝলাম, আমি বিশ্বাসঘাতক, বন্ধু নামের অপমান,—আমি মহা দুর্ব্বল। কিন্তু এও বুঝলাম, লীলাকে আমার চাই-ই; লীলাকে পেতে হ'লে চক্ষু-লজ্জা, বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব সমস্ত ডুবিয়ে দিতে হয়। হয় হোক্—তবু তাকে চাই। আমার সে অবস্থায় পড়লে বুঝতে। যখন তোমার একান্ত ভালবাসার পাত্র, তোমার আকাঙ্ক্ষিত একমাত্র বস্তু, পরের হ'তে যায় তখন কি ক'রে সয়তান মনের মধ্যে নৃত্য করে, তা কি জান? সে সময় শত্রু-মিত্র, উচিত-অনুচিত দেখবার সময় কোথায়?

"সে অবস্থায় পড়লে বুঝবে, তখন যদি কোথাও তোমার মনুষ্যত্ব একটু সজাগ হয়ে ওঠে, তাকে সুরার বিষাক্ত প্রবাহে ডুবিয়ে মারতে ইচ্ছে করে—কি না। তখন যদি তোমার মনের মধ্যে বিবেক ব'লে একটা কিছু তোমায় দংশন করতে আরম্ভ ক'রে দেয়, এই অমৃত ঢেলে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে—কি না!"

সরোজ চুপ করিল। আমি নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলাম; সে চুপ করার পর তাহাকে বলিলাম, 'সে কথা যাক্, তোমার মদ খাওয়ার এইটিই কি একমাত্র কারণ? আমায় কিছু লুকিও না!'

সে বলিল, "এ ছাড়া আর অন্য কিছুই নাই।"

তখন তাহাকে বলিলাম,—"ভাই সরোজ, যদি তোমাকে আমি বলি যে, লীলাকে আমি চাই না—কখনও চাই নাই—তুমিই তাকে বিয়ে কর, তা হ'লে কি মদ ছাড়তে পারবে?"

তাহার মুখে-চোখে একটা দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল—"পারবো না? নিশ্চয়ই পারবো!"

কিন্তু তাহার পর সে সংযত হইয়া বলিল, "বিমল, কিন্তু তুমি ভাই কেন এতটা করবে? দেখ, আমার এখন মনে হচ্ছে, আমি যে রাস্তা পাক্ড়েছি, তাতে সময়ে হয় ত সমস্ত ভুলতে পারবো; কিন্তু তুমি লীলাকে ভালবাসো, তোমার জীবন কেন দুঃখময় করব? তুমি-ই তার চাইতে লীলাকে বিয়ে কর—যাও, সুখী হও গিয়ে। আমি কালই এখান থেকে চ'লে যাবো।"

আমি দেখিলাম, এ ভাবে কথা চলিলে ফল কিছুই হইবে না। খুব দৃঢ়তার ভাণ করিয়া বলিলাম, "সরোজ, আমার কথা শোনো; তুমি আমার বন্ধু; শুধু বন্ধু নও, ভাই। তোমায় মাতাল হ'তে দেখ্‌লে কি কষ্ট হয় জান? যদি জান্‌তে, তা হ'লে বোধ হয় হ'তে না। আর লীলা? বল্‌লাম ত বহু দিন ভুলে গেছি তাকে। তুমি বোধ হয় জান না, আমার শীঘ্র বিয়ে হবার কথা হচ্ছে। এ কথা বোধ হয় তোমায় লুকিয়েছিলাম—ঠিক লুকিয়েছিলাম-ই বা বলি কি ক'রে; ইদানীং ত তোমায় আমায় দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। আমাদের গ্রামেরই এক মেয়েকে আমি বালিকা অবস্থা থেকে দেখে আস্‌ছি, সে এখন বিবাহযোগ্যা কিশোরী ও আমার স্বজাতীয়া; তাকেই আমি বিয়ে কর্‌ব, আর কিছু দিনের মধ্যে।

"লীলার কথা যে তোমাকে বলেছিলাম, সে কেবল রূপের মোহে। এখন সে মোহ কেটে গেছে, আমার মনে এখন লীলার চিন্তা কোথাও নাই।"

এই নিষ্ঠুর মিথ্যাকে ভাষা দিতে আমার বুকের মধ্যে যে বিদ্রোহ চলিতেছিল, তাহার শক্তির ভয়ে আমি নিজেই ভীত হইয়া পড়িতে-ছিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম, আমার এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতে সরোজের মুখ উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইতেছে। কথা শেষ হইবামাত্র সে আমার হাত দুইটি আবেগভরে চাপিয়া ধরিল :—

"সত্যি বল্‌ছো, বিমল?"

"হাঁ ভাই। এও কি ঠাট্টা কর্‌বার কথা?"

সে কিছু বলিতে পারিল না ; শুধু কৃতজ্ঞতা যেন জমিয়া দুইটি অশ্রু-বিন্দু হইয়া তাহার চোখের কোলে টল্‌টল্‌ করিতে লাগিল !

ধীর, সস্নেহ কণ্ঠে আমি তাহাকে বলিলাম, "কিন্তু ভাই, এই এম্‌নি আমার গা ছুঁয়ে তোমায় প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে যে, তুমি একবারে মদ ছেড়ে দেবে। ছিঃ ভাই, ভদ্রলোকের ছেলের লেখাপড়া শিখে কি মাতাল হওয়া সাজে ?"

তখন সে গাঢ়স্বরে আমায় বলিল, "বিমল, ভাই, তুমি আমায় ঘৃণা কোরো না। আমায় তোমার বন্ধুত্বের সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত কোরো না। আমায় সাহায্য কর, সান্ত্বনা দাও, সাহস দাও ; এ নেশা আমি দু'দিনেই ছেড়ে দিতে পারবো। এখনও আমি এর বশীভূত হইনি।"

তাহার ভাবভঙ্গির দৃঢ়তায় বুঝিলাম, এ মিথ্যা-প্রবঞ্চনার চেষ্টা নয়। তখন আমি আশ্বস্ত হইয়া ফিরিলাম। তাহার বাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইবার পর আমার পদদ্বয় যেন আর আমাকে বহন করিতে চাহিল না।

ক্ষণিক ভালবাসার বশে ছোট ছেলে তাহার নূতন বন্ধুকে প্রিয়তম খেলনাটি দিয়া যেমন সেই পরিতুষ্ট বালকটির সানন্দ গতির দিকে নিরানন্দে চাহিয়া থাকে, তাহার পর সেই ক্ষণিক উত্তেজনার হ্রাস হইলে ঐ বালক তাহার প্রিয় খেল্‌নাটির জন্য লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদে, কিন্তু আর তাহা ফিরিয়া পায় না। তাহার বন্ধু হয় ত তখন খেল্‌নাটি পাইয়া উহার দাতার কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায় !—ইহাই জগতের নিয়ম। আমিও

একবার সেই বালকের মত শূন্য বিষণ্ণদৃষ্টিতে সরোজের বাড়ীর দিকে চাহিলাম।

চারিদিন পরে স্বচক্ষে, যখন লীলাকে সরোজের হস্তে সমর্পিত হইতে দেখিয়া মজঃফরপুরে ফিরিবার জন্য ট্রেণে উঠিলাম, তখন আত্মপ্রসাদ নিতান্ত ব্যর্থ ভাবেই অন্তরের শূন্যতাকে আনন্দ দ্বারা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

—o—